Peace tv
পিস টিভি

জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ-৭

MOST COMMON QUESTIONS ASKED BY NON-MUSLIMS

ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের কিছু সাধারণ প্রশ্নের জবাব

MOST COMMON QUESTIONS ASKED BY NON-MUSLIMS

ডা. জাকির নায়েক

- অমুসলিমদের মক্কায় প্রবেশাধিকার নেই
- শুকর মাংশ নিষিদ্ধ
- সাক্ষীদ্বয়ের সমতা
- উত্তরাধিকার
- পরকাল-মৃত্যুর পরবর্তী জীবন
- মুসলমানরা এত ভাগে ভিভক্ত কেন
- মদ্য পানের নিষিদ্ধতা
- শুধু ইসলামেরই অনুসরণ করতে হবে কেন
- আকাশ ও পাতালের পার্থক্য
- অমুসলিমদের কাফের বলা

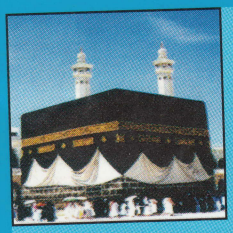

Peace Publication
পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
Peace Publication-Dhaka

ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের সাধারণ প্রশ্নের জবাব

REPLIES TO THE MOST COMMON QUESTIONS ASKED BY NON-MUSLIMS

ডা. জাকির নায়েক

অনুবাদ
মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
এফ.এম, এম.কম.
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
লেখক : শব্দে শব্দে আল কুরআন

Peace Publication
পিস পাবলিকেশন–ঢাকা
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

REPLIES TO THE MOST COMMON QUESTIONS ASKED BY NON-MUSLIMS

ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের সাধারণ প্রশ্নের জবাব

ড. জাকির নায়েক

গ্রন্থস্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক
মোঃ রফিকুল ইসলাম
সম্পাদক : কারেন্ট নিউজ

প্রকাশনায়
পিস পাবলিকেশন্স
ফোন ঃ ০১৭১৫৭৬৮২০৯

পরিবেশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা – ১১০০।

তৃতীয় সংস্করণ
মার্চ ২০০৯

কম্পিউটার কম্পোজ
মাহফুজ কম্পিউটার

ISBN : 984-70256-6

মূল্য : ৫০.০০ টাকা।

REPLIES TO THE MOST COMMON QUESTIONS ASKED BY NON-MUSLIMS :
Dr. Zakir Naik Translated By Mohammad Habibur Rahman
Published By Md. Rafiqul Islam,
Peace Publication, Dhaka.

Price : Tk. 50.00

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় মা'কে–
যিনি ছেলেকে মাদরাসায় পাঠিয়ে
ফেরার অপেক্ষায় চেয়ে থাকতেন।

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা		৫
প্রকাশকের কথা		৬
ডা. জাকির নায়েকের জীবনী		৭
ভূমিকা		১১
১.	বহু বিবাহ	১৪
২.	একাধিক স্বামী গ্রহণ	১৯
৩.	হিজাব বা নারীর পর্দা	২০
৪.	ইসলাম কি তরবারির জোরে প্রসার লাভ করেছে?	২৬
৫.	মুসলমানরা মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী	২৯
৬.	আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ	৩২
৭.	পশু যবেহ করার ইসলামি পদ্ধতি দৃশ্যত অত্যন্ত নির্মম	৩৭
৮.	আমিষ জাতীয় খাদ্য মুসলমানদের অত্যন্ত উগ্র করে তোলে	৩৯
৯.	মুসলমানরা কা'বার পূজো করে	৪০
১০.	মক্কায় অমুসলিমদের প্রবেশাধিকার নেই	৪২
১১.	শূকর মাংসের নিষিদ্ধতা	৪৩
১২.	মদপানের নিষিদ্ধতা	৪৬
১৩.	নর-নারীর সাক্ষ্যের সমতা	৫০
১৪.	উত্তরাধিকার আইন	৫৪
১৫.	আল কুরআন আল্লাহর বাণী কিনা?	৫৮
১৬.	আখিরাত– তথা মৃত্যু পরবর্তী জীবন	৬১
১৭.	দলে-উপদলে মুসলমানদের বিভক্তি প্রথা তাদের চিন্তা-চেতনার পার্থক্য	৬৭
১৮.	সকল ধর্মই মানুষকে সত্য ও কল্যাণের শিক্ষা দেয় তাহলে শুধু ইসলামকে অনুসরণ করতে হবে কেন?	৭১
১৯.	ইসলাম ও মুসলমানদের বর্তমান অনুশীলনের মধ্যে অনেক পার্থক্য	৭৭
২০.	অমুসলিমদের 'কাফির' বলা	৭৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের, যিনি বর্তমান প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ চিন্তানায়ক ডা. জাকির নায়েকের 'ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের কিছু সাধারণ প্রশ্নের জবাব' শীর্ষক বক্তৃতামালা বাংলা ভাষায় অনুবাদের তৌফিক দিলেন।

দরূদ ও সালাম মানবতার মুক্তির দিশারি মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি, যাঁর আনীত বিশ্বজনীন মতাদর্শকে বিরুদ্ধবাদীদের সামনে যৌক্তিকভাবে তুলে ধরতে উম্মতের একাংশ নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। মুসলিম বিশ্বের চরম দুর্দিনে ইসলামের স্বরূপ উন্মোচনে বর্তমান বিশ্বে যে ক'জন মুসলিম মনীষী প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ডা. জাকির নায়েক। স্যাটেলাইট চ্যানেলের কল্যাণে ডা. নায়েক বাংলাভাষী ব্যাপক সংখ্যক দর্শক-শ্রোতার কাছে পরিচিত এক নাম। যিনি সাধারণ মুসলিমসহ বিশ্বের অন্যান্য ধর্মের পণ্ডিত, দর্শক-শ্রোতাদের সামনে ইসলামের সুমহান আদর্শকে অত্যন্ত সাবলীলভাবে তুলে ধরতে সিদ্ধহস্ত।

ডা. নায়েক ইসলাম সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের যে কোনো প্রশ্নের বিজ্ঞানভিত্তিক জবাব দানের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছেন। ডা. নায়েকের এ বক্তৃতামালা ইংরেজি ভাষায় প্রচারিত হওয়ায় বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাংলা ভাষাভাষী পাঠক-শ্রোতা যাদের ইংরেজিতে দক্ষতা কম বা একেবারেই নেই তাদের সেই সীমাবদ্ধতা দূর করতে শ্রদ্ধেয় জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম (সম্পাদক কারেন্ট নিউজ) উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তারই অংশ হিসেবে তিনি ডা. জাকির নায়েকের বক্তৃতাসমগ্র যা ইংরেজিতে গ্রন্থিত 'REPLIES TO THE MOST COMMON QUESTIONS ASKED BY NON-MUSLIMS' বইখানা আমাকে অনুবাদের জন্য দেন।

এমনিতেই অপর ভাষার জীবন-সাহিত্য-সংস্কৃতিজাত শব্দ সম্ভারের মূলভাব ঠিক রেখে অনুবাদ করা এক কঠিন কাজ। তদুপরি ডা. জাকির নায়েকের মতো একজন বিদগ্ধ পণ্ডিতের বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিগুলো ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়ে মনে হলো অনুবাদ শুধু কঠিনই নয়, দুরূহও বটে। তথাপি শত সীমাবদ্ধতার আগল ভেঙে কাজটি শেষ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামি পরিভাষাগুলো ঠিক রাখার প্রয়াস ও অন্যান্য বিষয়ে সহজ ও সাবলীলতার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তারপরও অনুবাদের ক্ষেত্রে নবীন হওয়ায় কিছু ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। আশা করি পাঠক বিষয়টি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে বিবেচনার পাশাপাশি সুপরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করবেন।

পরিশেষে অনুবাদ করতে গিয়ে যাদের পরামর্শ, সহযোগিতা, উৎসাহ পেয়েছি তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতার পাশাপাশি সফল উদ্যোক্তা জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম সাহেবের জন্য দুআ করছি যেন আল্লাহ তাঁর এ উদ্যোগকে কবুল করে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করেন। আমীন!

নভেম্বর ২০, ২০০৮ ঈসায়ী

অনুবাদক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রকাশকের কথা

অনেকদিন থেকে মনের গভীরে দুটো ইচ্ছে পোষণ করে আসছিলাম; কিন্তু তা পূরণ করার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। একটি ইচ্ছে ছিল কোলকাতার বইমেলায় যাওয়া, আর দ্বিতীয় ইচ্ছে ছিল মুম্বাই গিয়ে ডা. জাকির নায়েকের সাথে সাক্ষাৎ করা। আল্লাহর মেহেরবাণীতে অবশেষে কোলকাতা যাওয়ার একটা সুযোগ হলো; কিন্তু সময় সংক্ষিপ্ততার কারণে দ্বিতীয় ইচ্ছেটি এ যাত্রায় পূরণ করা গেল না।

তবে আল্লাহর অশেষ রহমতে ০৩-১২-২০০৮ তারিখে হজ পালন অবস্থায় কাবা ঘরের চত্বরে জমজম টাওয়ারে ডা. জাকির নায়েকের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে দ্বিতীয় ইচ্ছেটি পূরণ হয়।

কোলকাতা বইমেলা–২০০৮ এ আসতে পেরে নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে হলো। মনে হলো আরো আগেই মেলায় আসা উচিত ছিল। অনেক তারকাসমৃদ্ধ বইয়ের মাঝে ডা. জাকির নায়েকের বেশ ক'টি বইও দেখলাম জ্বলজ্বল করছে। তবে সব বই-ই ইংরেজি ভাষায়। ভাবলাম জাকির নায়েকের সাথে তো আর এ যাত্রায় দেখা করা সম্ভব হলো না। তাঁর কিছু বই বাংলাদেশে নিয়ে যাই এবং সেগুলো বাংলায় ভাষান্তর করে আমাদের দেশের পাঠকদের হাতে পৌঁছিয়ে দেই। তাঁর সম্পর্কে, তাঁর মেধা ও যোগ্যতা এবং দ্বীনী দাওয়াতের কৌশল সম্পর্কে আমার দেশের জনগণকে অবহিত করতে পারলে এবং এতে করে যদি কিছুলোকও দ্বীনের পথে এগিয়ে আসে, তাহলে এটাই আমার নাজাতের উসিলা হয়ে যেতে পারে।

বাংলা ভাষায় ইতোমধ্যে ডা. জাকির নায়েকের দু'চারটা বই অবশ্য বিক্ষিপ্তভাবে বের হয়েছে। তবে প্রকাশকরা বইগুলোর অনুবাদে যথাযথ মান রক্ষা করতে সক্ষম হন নি। সে যাই হোক, ডা. জাকির নায়েকের বইগুলোর ব্যাপক প্রচার আবশ্যক। তবে যারাই তাঁর বইগুলো প্রকাশ করেন তারা যেন তাঁর সুনাম-সুখ্যাতি বজায় রাখতে প্রয়াসী হন, সেটাই কাম্য।

তারপর যে কথাটি না বললেই নয়, পিস পাবলিকেশন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এখনো নবীন। মানুষ ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। তদুপরি বিভিন্ন সংকট-সমস্যার কারণে কিছু ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। সম্মানিত পাঠকদের দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে অবহিত করলে ইনশাআল্লাহ আমরা এটাকে স্বাগত জানাব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নেবো। পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে দীনী দাওয়াতের কাজের উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধি কামনা করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনে নাজাতের আশা রেখে শেষ করছি।

২০০৮ — প্রকাশক

ডা. জাকির আব্দুল করিম নায়েক-এর জীবনী

ডা. জাকির আব্দুল করিম নায়েক ১৯৬৫ সালের ১৫ অক্টোবর ভারতের মুম্বাইয়ে জন্মগ্রহণ করেন। মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.বি.বি.এস ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যমে পেশায় একজন ডাক্তার হলেও ১৯৯১ সাল থেকে তিনি বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারে একনিষ্ঠভাবে মনোনিবেশ করার ফলে চিকিৎসা পেশা থেকে অব্যাহতি নেন। মাত্র ২৬ বছর বয়সে কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে বৈজ্ঞানিক, গঠনমূলক যুক্তি ও অন্যান্য প্রমাণাদির মাধ্যমে তিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াসী হন। এ সময়ে ইসলামের দাওয়াতের পাশাপাশি অমুসলিম ও অসচেতন মুসলিম বিশেষ করে শিক্ষিত মুসলিমদের মধ্য থেকে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা ও বিশ্বাস দূরীকরণার্থে ভারতের মুম্বাইয়ে তিনি 'ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন' (আই.আর.এফ) নামক এক দাতব্য প্রতিষ্ঠান চালু করেন।

উল্লেখ্য যে, ইসলাম ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্মের ওপরে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তথ্যাবলি ইসলামিক রিচার্স ফাউন্ডেশনের সংগ্রহে রয়েছে। পরবর্তীতে তাঁরই উদ্যোগে আই.আর.এফ 'এডুকেশনাল ট্রাস্ট' ও 'ইসলামিক ডিমেনসন' নামক দুটি সংস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁদের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত। এজন্য আন্তর্জাতিক স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল, ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্ক (বিশেষত তাদের নিজস্ব টিভি নেটওয়ার্ক 'Peace TV', ইন্টারনেট এবং প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্বের লাখ লাখ মানুষের কাছে এটি ইসলামের প্রকৃত রূপকে উপস্থাপনে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। গৌরবান্বিত আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের পাশাপাশি মানবীয় কারণ, যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সাপেক্ষে এটি প্রকৃত সত্য সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষের বোধগম্যতা ও ইসলামের শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাখ্যা প্রদান করে।

ডা. জাকির মূলত ইসলামের দাঈ'র অনন্য দৃষ্টান্ত। 'ইসলামিক রিচার্স ফাউন্ডেশন' গঠন ও তার পরিচালনার কঠিন সংগ্রামের পেছনে তিনিই প্রধান তদারককারী। আধুনিক ভাবধারার এই পণ্ডিতের ইসলাম ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্মের বিশ্লেষণে বিশ্ববিখ্যাত সুবক্তা ও বিশিষ্ট লেখক হিসেবেও জুড়ি নেই। তাঁর বক্তব্যের পক্ষে ব্যাপকভাবে অক্ষরে অক্ষরে গৌরবান্বিত আল-কুরআন, সহীহ্ হাদীস ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে তথ্য ও প্রমাণপঞ্জি পৃষ্ঠা নম্বর, খণ্ড ইত্যাদিসহ উল্লেখ করার কারণে যে কেউ তাঁর বক্তব্য বা প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করুক বা তাঁর এ পর্ব শ্রবণ করুক না কেন, সে বিস্মিত ও অভিভূত না হয়ে পারে না। জনসমক্ষে আলোচনার সুতীক্ষ্ণ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্য উত্তর প্রদানের জন্য তিনি সুপ্রসিদ্ধ।

অন্যান্য ধর্মের বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে আনুষ্ঠানিক আলোচনা (বিতর্ক) ও সংলাপের সময় বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় আল্লাহর রহমতে তিনি সফলতার সাথে বিজয়ী হয়েছেন। ২০০০ সালের ১ এপ্রিল আমেরিকার শিকাগো শহরের আই.সি.এন.এ.ই কনফারেন্সে 'বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন' বিষয়ে এক আমেরিকান চিকিৎসক ও খ্রিস্টানধর্ম প্রচারক ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল-এর সঙ্গে তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল হচ্ছেন সেই লেখক যিনি তিন বছর ধরে গবেষণা করার পর 'ইতিহাস ও বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন ও বাইবেল' (১৯৯২ সালে ১ম সংস্করণ এবং ২০০০ সালে ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়) নামক দুটি গ্রন্থ লিখতে সমর্থ হন, যে বইটিকে তিনি ১৯৭৬ সালে ডা. মরিস বুকাইলির লেখা 'বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান' নামক বইটির উত্থাপিত অভিযোগগুলোর খণ্ডনকারী হিসেবে ধারণা করেন। শেখ আহমাদ দীদাত ১৯৯৪ সালে ডা. জাকির নায়েককে ইসলাম ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্ম বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত

বক্তা হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং ২০০০ সালের মে মাসে দাওয়াহ্ ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্মের ওপর গবেষণার জন্য 'হে তরুণ! তুমি যা চার বছরে করেছ, তা করতে আমার চল্লিশ বছর ব্যয় হয়েছে– "My Son, what I could not do four years." আলহামদুলিল্লাহ' খোদাই করা একটি স্মারক প্রদান করেন।

জনসমক্ষে আলোচনার জন্য ডা. জাকির পোপ বেনেডিক্টকে চ্যালেঞ্জ করেন, যা সারা বিশ্ব অবলোকন করেছে। বেনেডিক্ট নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে অসম্মানজনক ও বিতর্কিত মন্তব্য করায় সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ক্ষোভ স্ফুলিঙ্গের মতো দাউদাউ করে জ্বলছিল। তাই মুসলিমদের এ উদ্বেগ নিবারণ করতে পোপ বিশটি ইসলামিক দেশ থেকে কূটনীতিকদেরকে রোমের দক্ষিণে তার গ্রীষ্মকালীন বাসভবনে আলোচনার জন্য আহ্বান জানায়। কিন্তু ডা. জাকির তাকে একটি প্রকাশ্য সংলাপের জন্য আহ্বান করে বলেন যে, 'ইসলাম সম্পর্কে তার এই বিতর্কিত মন্তব্যের ফলে মুসলিম বিশ্বব্যাপী যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা শান্ত করতে এটি যৎসামান্য প্রচেষ্টা মাত্র। মূলত ইসলাম সম্পর্কে পোপের এ মন্তব্য পূর্বপরিকল্পিত। পোপ জার্মানির রিজেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যা বলেছিলেন সে ব্যাপারে তিনি নিজেই ভালোভাবে অবগত।

তাই মুসলিমদের প্রতি পোপের এ দুঃখ প্রকাশ করাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেয়ারই নামান্তর। পোপের উচিত ছিল গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশের পাশাপাশি তার মন্তব্য তুলে নেয়া। দেখে মনে হয়, প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের পদাঙ্কই পোপ বেনেডিক্ট অনুসরণ করে চলছেন। ডা. জাকির আরো বলেন, 'পোপ যদি সত্যিই সঠিক সংলাপের মধ্যদিয়ে এ উত্তেজনা শান্ত করতে প্রয়াসী হন, তাহলে তার উচিত হবে জনসমক্ষে একটি প্রকাশ্য বিতর্ক করা। বিশ্বব্যাপী সম্প্রচারের সুবিধা সম্বলিত আন্তর্জাতিক টিভি নেটওয়ার্কের ক্যামেরার সামনে পোপ বেনেডিক্ট-এর সঙ্গে আমি জনসমক্ষে প্রকাশ্য সংলাপ বা বিতর্কে অংশ নিতে দৃঢ়ভাবে ইচ্ছুক। এর ফলে সারা বিশ্বের ১ কোটি ৩০ লাখ মুসলমান ও ২ কোটি খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা সেই বিতর্ক অনুষ্ঠান দেখতে ও শুনতে পারবে।

পোপের ইচ্ছেমতোই কুরআন ও বাইবেল-এর যেকোনো বিষয়ের ওপর সংলাপে বা বিতর্কে আমি রাজি। তাছাড়া এটা কেবল বিতর্ক অনুষ্ঠানই হবে না; বরং এখানে উপস্থিত ও অনুপস্থিত দর্শক-শ্রোতার জন্য প্রশ্নোত্তর পর্বও থাকতে হবে। আর এটা পোপের ইচ্ছেমতো কোনো রুদ্ধদ্বার বৈঠক হবে না, যেমনটা তার পূর্বসূরি দ্বিতীয় পোপ জন পল দক্ষিণ আফ্রিকান ইসলামি পণ্ডিত আহমেদ দীদাতের খোলামেলা সংলাপের আহ্বানে চেয়েছিলেন। শেখ দীদাতকে পোপ জন পল তার নিজের কক্ষে এসে বিতর্ক করতে বলেছিলেন।

একটি আন্তঃবিশ্বাসগত সংলাপ কেন রুদ্ধদ্বারের মধ্যে সংঘটিত হবে? উপরন্তু আমার জন্য যদি একটি ইটালিয়ান ভিসা সংগ্রহ করা হয় তাহলে মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে পোপের সাথে বিতর্ক করতে আমি রোম বা ভ্যাটিক্যানে নিজের খরচায়ও যেতে পারি। তবে একথা সবার মনে রাখতে হবে যে, 'মুসলমানদের নিজস্ব মিডিয়াই হচ্ছে ইসলামের ওপরে আক্রমণের জবাবে প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানার উৎকৃষ্ট উপায়। দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ আন্তর্জাতিক মিডিয়া পশ্চিমা সমর্থনপুষ্ট। সুতরাং আমাদের যদি নিজস্ব মিডিয়া না থাকে তাহলে পশ্চিমারা সাদাকে কালো করে ফেলবে, দিনকে রাত করে ফেলবে, নায়ককে সন্ত্রাসী বানাবে আর সন্ত্রাসীকে বানাবে নায়ক।'

রিয়াদে অবস্থিত শ্রীলংকার দূতাবাস কর্তৃক আয়োজিত বহুসংখ্যক রাষ্ট্রদূত, কূটনীতিক ও শ্রীলংকার জনগণের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত 'ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা সম্পর্কিত ২০টি সাধারণ প্রশ্ন' শীর্ষক আলোচনা সভায় ডা. জাকির তাঁর বক্তব্যের শেষে এক ইন্টারনেট সাক্ষাৎকারে এ কথাগুলো বলেন।

ষোড়শ পোপ বেনেডিক্ট যদি খ্রিস্টানধর্ম ও বাইবেলের ওপর কোনো বিশ্বাস না রাখেন, তাহলে তার কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়; বরং জনসমক্ষে একটা বড় আকারের খোলামেলা বিতর্কের মাধ্যমে ডা. জাকিরের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা উচিত। কিন্তু পোপের যদি খ্রিস্টানধর্ম ও বাইবেলের ওপর আত্মবিশ্বাস না থাকে অথবা তিনি যদি খ্রিস্টানধর্ম ও বাইবেলকে ততটুকু পরিমাণে বিশ্বাস না করেন যাতে বড় রকমের কোনো বিতর্কে অংশগ্রহণ সম্ভব নয়; তাহলে মুসলমানদের অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না এই পোপ বেনেডিক্ট তার জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাসের পরিধি বাড়ানোর মাধ্যমে ডা. জাকিরের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে অথবা পদত্যাগ করার মাধ্যমে পরবর্তী পোপকে এ সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করার নিশ্চয়তা দেন। অবশেষে যদি এ বিতর্ক পরিচালিত হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা ইসলাম সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বের মানুষের ভুল ধারণা দূর করতে সক্ষম হব এবং সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে ইসলামের সত্যতা ও খ্রিস্টান ধর্মের মিথ্যাচারিতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে।

মুসলমানদের সাথে সংলাপ করার জন্য পোপ বেনেডিক্ট অবশ্য প্রথমাবস্থায় তার আন্তরিক ইচ্ছে ব্যক্ত করেছেন; কিন্তু ডা. জাকিরের আহ্বানের পর থেকে এমন ভঙ্গিমা দেখাচ্ছেন যে, মনে হয় মুসলমানদের সাথে সংলাপের জন্য তিনি কখনো আহ্বানই জানান নি অথবা এ ধরনের কোনো কিছু সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বিশ্বের অনেক মুসলমান পোপ বেনেডিক্ট-এর সাথে ডা. জাকির নায়েকের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে পশ্চিমা মিডিয়া যেমন বিভিন্ন জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল, পত্র-পত্রিকার অফিসে ই-মেইল করেছে; কিন্তু তারাও পোপের ভান করছে। তাই সমগ্র মুসলিম বিশ্বের আজ একটাই প্রশ্ন, ডা. জাকির নায়েকের চ্যালেঞ্জে সমগ্র পশ্চিমা মিডিয়া বিশেষ করে পোপ নিজেই কেন এখন নিশ্চুপ?

ডা. জাকির সাধারণত লিখিত কোনো বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন না; বরং সর্বদা জনসমক্ষে বিতর্ক করেন। কারণ, এটা সবার জানা কথা যে, লিখিতভাবে কোনো বিতর্ক করলে তা কখনো শেষ হবার নয়; কিন্তু প্রকাশ্যে বিতর্ক করলে তা কার্যকরীভাবে একটা ফলাফল বয়ে আনে।

যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলস বিমানবন্দরের একটি ঘটনায় তাঁর দক্ষতা সম্পর্কে একটি উদাহরণ দেয়া যাক :

১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মুসলমানদের যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে অনেক বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে অধিকাংশ মুসলিম বিভিন্ন প্রশ্নের যথোপযুক্ত উত্তর দিতে না পারার জন্য অযথা হয়রানির শিকার হন। কিন্তু ইসলাম ও মানবতার প্রতি অবদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইন্টারনেট ইউনিভার্সিটি' কর্তৃক দেয়া পুরস্কার গ্রহণ করতে ১২ অক্টোবর ডা. জাকির নায়েক যখন লসএঞ্জেলস বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তখন তাঁর ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেছে কি-না তা জানতে ইমিগ্রেশন অফিসারের আচরণ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'আমার জন্য সেখানে কোনো সমস্যা ছিল না এবং তাদের সবার ব্যবহার ছিল মনোমুগ্ধকর।' কয়েকটি সৌদী সংবাদপত্র ডা. জাকির নায়েকের এ সাক্ষাৎকার নেয়ার পরবর্তী অনুসন্ধানে জানতে পারে যে, লসএঞ্জেলস বিমানবন্দরে অবতরণের পর ডা. জাকিরও তার দাড়ি এবং মাথার টুপির জন্য কাস্টম অফিসারদের দৃষ্টির আড়াল হতে পারেন নি। তাই সাথে সাথে তাঁকেও প্রশ্ন করার জন্য অনুসন্ধান করা শুরু করে।

যেমন : ১১ সেপ্টেম্বরের আক্রমণ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চেয়ে 'জিহাদ' শব্দটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তখন ডা. জাকির নায়েক বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ, কুরআন,

তালমুদ, তাওরাত (ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ), মহাভারত, ভগবত গীতাসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেয়ার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, জিহাদ শুধু ইসলামিক নয়; বরং বৈশ্বিক একটি বিষয়। এ কথা শুনে কাস্টম অফিসাররা উৎসাহী হয়ে আরো প্রশ্ন করেন। কিন্তু ওদিকে ডা. জাকির তাঁর মেধা, জ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা উত্তর দেয়ার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখেন। ইতোমধ্যে এক ঘণ্টা সময় পার হয়ে যায়। অন্যদিকে যেহেতু প্রশ্ন করার কারণে দীর্ঘ লাইনে লোকজন অপেক্ষা করছিল তাই ডা. জাকিরকে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেয়া হয়। যখন তিনি উঠে দাঁড়ান ও কক্ষটি ত্যাগ করেন তখন প্রায় ৭০ জন কাস্টম অফিসার তাদের নিজেদের ধর্ম ও ইসলাম সম্পর্কে জানতে তাঁর পিছে পিছে যাচ্ছিল। পরবর্তীতে কাস্টম অফিসারগণ বলেন যে, তারা বিস্মিত হয়েছেন এবং তারা জীবনে কখনো এতো জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি দেখেন নি।

আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ড, সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, সাউথ আফ্রিকা, মৌরিতানিয়া, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, থাইল্যান্ড, ঘানা (দক্ষিণ আফ্রিকা) সহ আরো অনেক দেশে এ পর্যন্ত নয়শোরও বেশি বার জনসম্মুখে প্রকাশ্য আলোচনায় বিভিন্ন ধর্ম বিশেষ করে ইসলাম, খ্রিস্টান ও হিন্দু ধর্মের ওপর তুলনামূলক বক্তব্য দিয়েছেন। উপরন্তু ভারতেও তিনি অসংখ্য বার বক্তব্য প্রদান করেছেন। যার অধিকাংশ অডিও এবং ভিডিও আকারে এবং ইদানিং বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থাকারে পাওয়া যায়। বিশ্বের একশোরও বেশি দেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক টিভি ও স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলে ডা. জাকিরকে প্রতিনিয়ত দেখা যায়। তিনি প্রায় প্রতিনিয়তই সাক্ষাৎকারের জন্য আমন্ত্রিত হন।

ভারতের মিডিয়া ছাড়াও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় রয়েছে তাঁর প্রভাব। ভারতীয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা যেমন : ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ইনকিলাব, দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট, দ্য ডেইলি মিডডে, দ্য এশিয়ান এইজ ছাড়াও অন্যান্য পত্রিকা তাঁর অনেক বক্তব্য প্রকাশ করেছে। বাহরাইন ট্রিবিউন, রিয়াদ ডেইলি, গালফ টাইমস, কুয়েত টাইমসসহ আরো অন্যান্য সংবাদপত্রে ইংরেজি ছাড়াও বিভিন্ন ভাষায় ডা. জাকির নায়েক সম্পর্কে অনেক প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও তাঁর বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি সাধারণত ইংরেজিতে বক্তব্য দেন। তাঁর দর্শক-শ্রোতার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন দেশের সম্মানিত রাষ্ট্রদূত, আর্মি জেনারেল, রাজনৈতিক নেতা, নামকরা খেলোয়াড়, ধর্মীয় পণ্ডিত, শিল্প ও বাণিজ্য সংগঠক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ মানুষ। তাঁর অধিকাংশ বক্তব্য ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের নিজস্ব নেটওয়ার্ক 'Peace TV'- এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়। তাঁর বক্তব্যগুলোতে খুবই সাধারণ ভূমিকা রয়েছে এবং একজন আন্তর্জাতিক বক্তা হিসেবে তিনি তাঁর প্রায় সকল বক্তব্যে কুরআন ও সহীহ হাদীসের বাণীগুলো বিজ্ঞান ও যুক্তির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেন। ফলে দর্শক ও শ্রোতারা সহজেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। ধর্মগ্রন্থগুলো সম্পূর্ণভাবে মুখস্থ করার মতো অসাধারণ গুণটি তাঁর সম্পর্কে বিশেষভাবে লক্ষণীয় একটি বিষয়। মনে হয় কুরআন, বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ, তালমুদ, তাওরাত (ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ), মহাভারত, ম্যানুসম্যারিটি, ভগবতগীতা ও বেদসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের হাজার হাজার পৃষ্ঠা সম্পূর্ণভাবে তাঁর মুখস্থ রয়েছে। তাছাড়াও বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক বিষয় এবং তত্ত্বেও রয়েছে তাঁর পূর্ণ দখল। কেননা তিনি কোনো তথ্যসূত্র উল্লেখ করলে তার পৃষ্ঠা, অধ্যায় ও খণ্ডসহ উল্লেখ করেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

দীনের দাওয়াত দেয়া একটি অর্পিত দায়িত্ব

অধিকাংশ মুসলমান জানেন যে, ইসলাম একটি বিশ্বজনীন জীবন ব্যবস্থা যা সমগ্র মানবজাতির জন্য মনোনীত করা হয়েছে। আল্লাহ সমগ্র বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। মানবজাতির কাছে তাঁর বাণী পৌঁছানোর দায়িত্বে তিনি মুসলমানদেরকে নিয়োজিত করেছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলিম জাতি তাদের সে দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যদিও উত্তম জীবন পদ্ধতি হিসেবে ইসলামকে আমাদের নিজেদের জন্যই পুরোপুরি গ্রহণ করা ছিল আমাদের কর্তব্য; কিন্তু অধিকাংশ মুসলমানই সেসব সত্যকে জানার ব্যাপারে অংশীদার করে নিতে অনিচ্ছুক যাদের নিকট সত্যের বাণী এখনো পৌঁছানো হয় নি।

কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে–

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ـ

অর্থ : আর তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে হতে পারে, যে গোপন করে সেই সত্যের সাক্ষ্যকে, যা তার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ অজানা নন। (সূরা বাকারা : ১৪০)

অত্যন্ত সাধারণ বিশটি প্রশ্ন

ইসলামে পৌঁছাবার লক্ষ্যে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও বিতর্কানুষ্ঠান কাঙ্খিত ও অনুমোদিত পদ্ধতি।

কুরআন মাজীদ ঘোষণা করেছে—

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ـ

অর্থ : আপনি মানুষকে আপনার প্রতিপালকের পথের প্রতি ডাকুন হিকমত সহকারে ও উত্তম উপদেশ দিয়ে এবং তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করুন। (সূরা নাহ্‌ল : ১২৫)

একজন অমুসলিমের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছানোর ব্যাপারে ইসলামের ইতিবাচক দিকগুলো সামনে নিয়ে আসাই যথেষ্ট হতে পারে না। অধিকাংশ অমুসলিম ইসলামের যথার্থ সত্য বিষয়গুলোর সাথে একমত পোষণ করে নিতে পারে না। এর কারণ হলো, ইসলাম সম্পর্কে তাদের মনের গভীরে কিছু প্রশ্ন জেগে আছে যার উত্তর তারা পায় নি।

তারা হয়তো ইসলামের কল্যাণকর ইতিবাচক দিকগুলো সম্পর্কে আপনার যুক্তির সাথে একমত হতে পারে; কিন্তু তার সাথে সাথে তারা বলবে, 'ওহ, তোমরা তো সেই মুসলমান যারা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে থাক। তোমরা সেই লোক যারা নারীদেরকে পর্দার নামে চার দেওয়ালে বন্দি করে রাখ। তোমরা তো মৌলবাদী, ইত্যাদি ইত্যাদি।'

আমি ব্যক্তিগতভাবে অমুসলিমদেরকে উদাত্তকণ্ঠে বলতে চাই যে, তারা ইসলাম সম্পর্কে যা ধারণা করে তা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। ইসলাম সম্পর্কে তাদের ধারণা অত্যন্ত সীমিত, তা ভুল হোক বা শুদ্ধ হোক এবং যে উৎস থেকেই তা গৃহীত হোক না কেন। আমি সরাসরি তাদেরকে বলতে চাই যে, ইসলাম সম্পর্কে তাদের ধারণার অনুভূতি একেবারেই ভুল। আমি তাদেরকে উৎসাহিত করছি খোলা মনে সুস্পষ্ট বক্তব্য নিয়ে আসার জন্য। আমি তাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আমি ইসলাম সম্পর্কে তাদের গঠনমূলক সমালোচনাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি।

গত কয়েক বছরের আমার দাওয়াতী কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে আমি এটা অনুধাবন করেছি যে, একজন সাধারণ অমুসলিম ব্যক্তির মনে ইসলাম সম্পর্কে সর্বোচ্চ ২০টি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। আপনি যখন অতি সাধারণ অমুসলিমকে জিজ্ঞাসা করবেন, "তোমার মতে ইসলামে কী কী ভুল রয়েছে?" সে তখন পাঁচ কি ছয়টি প্রশ্ন করতে পারবে, যে প্রশ্নগুলো উক্ত বিশটি অতি সাধারণ প্রশ্নগুলোর মধ্যে শামিল রয়েছে।

অধিকাংশ মানুষ যুক্তিনির্ভর উত্তরে আশ্বস্ত হয়

২০টি অতি সাধারণ প্রশ্নের উত্তর যুক্তি প্রমাণ ও কার্যকারণ উদাহরণ সহকারে দেয়া যেতে পারে। অধিকাংশ অমুসলিম-ই এসব উত্তরে আশ্বস্ত হবেন বলে আমার বিশ্বাস। যদি কোনো মুসলমান এ উত্তরগুলো মুখস্থ করেন অথবা মনে রাখতে চেষ্টা করেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ তিনি সফল হবেন, যদি ইসলামের পূর্ণাঙ্গ সত্যকে কোনো অমুলিম গ্রহণ না-ও করে, অন্ততপক্ষে ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে তাদের

ভুল ধারণাসমূহ দূর করা এবং ইসলাম সম্পর্কে তাদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে নিরপেক্ষ অবস্থানে অবশ্যই নিয়ে আসতে সক্ষম হবে। একেবারে হাতে গোনা কিছু সংখ্যক অমুসলিম এসব উত্তরের বিপক্ষে পাল্টা যুক্তি পেশ করতে সক্ষম হতে পারে, যার জন্য অতিরিক্ত তথ্য প্রমাণের প্রয়োজন হতে পারে।

প্রচার মাধ্যমের সৃষ্ট ভুল ধারণাসমূহ

ইসলাম সম্পর্কে অধিকাংশ অমুসলিমের মনে ভুল ধারণাসমূহ সৃষ্টি হয়েছে আধুনিক তথ্য প্রবাহের অনবরত ভুল তথ্য প্রচারের কারণে। আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমগুলো নিয়ন্ত্রণ করে পাশ্চাত্য জগৎ, তা এটি আন্তর্জাতিক স্যাটেলাইট চ্যানেল, রেডিও স্টেশন, খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন বা বই-পুস্তক যা-ই হোক না কেন। সম্প্রতি ইন্টারনেট একটি শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। যদিও এটি কোনো বিশেষ পক্ষের নিয়ন্ত্রণে নেই। তারপরও এর মধ্যে একজন মানুষ ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক হিংসাত্মক প্রচারণা দেখতে পারে। ইদানিং মুসলমানরাও প্রচার মাধ্যমটির মাধ্যমে ইসলামের সার্বিক ধারণা মানুষের সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সীমিত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু তা ইসলাম বিরোধী প্রচারণার তুলনায় একেবারেই নগণ্য। আমি আশা করি মুসলমানদের এ প্রচেষ্টা দিনে দিনে আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং স্থায়ী হবে।

ভুল ধারণা সময়ের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়

ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণাসমূহ থেকে স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে এ বিশটি প্রশ্ন বাছাই করে নেয়া হয়েছে। কয়েক দশক আগেও প্রশ্নগুলোর ধরন ভিন্ন আঙ্গিকে ছিল, আর কয়েক দশক পরেও এগুলোর ধরন পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে, এটা নির্ভর করবে প্রচার মাধ্যমগুলো কীভাবে ইসলামকে উপস্থাপন করবে, তার ওপর।

ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলো সারা বিশ্বে প্রায় একই রকম

বিশ্বের বিভিন্ন অংশের লোকদের সাথে মত বিনিময়ের পর আমি ইসলাম সম্পর্কে উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করেছি। সমাজ ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির পার্থক্যের কারণে হয়তো দু' একটি প্রশ্ন এর সাথে যুক্ত হতে পারে। যেমন আমেরিকাতে এ প্রশ্নটি যোগ হতে পারে যে, সুদ গ্রহণ ও প্রদানে ইসলাম নিষেধ করে কেন?

আমি ভারতীয় সামাজিক প্রেক্ষিতে উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর সাথে ভারতীয় অমুসলিমদের একটি প্রশ্ন যোগ করেছি। যেমন মুসলমানরা এতো আমিষ খায় কেন অর্থাৎ তারা নিরামিষভোজী নয় কেন?" এ প্রশ্নটি যোগ করার কারণ হলো, ভারতীয় বংশদ্ভূতরা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং তারা বিশ্ব জনসংখ্যার

প্রায় এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ শতকরা ২০ ভাগ। অতএব তাদের প্রশ্নটি সাধারণ প্রশ্নগুলোর সাথে যুক্ত হতে পারে।

ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়নকারী অমুসলিমদের ভুল ধারণা

অনেক অমুসলিম রয়েছেন যারা ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনা করেছেন। তবে তারা যা পড়ছেন তা সবই পক্ষপাত দোষে দুষ্ট এবং ইসলামের বই-পুস্তকের সমালোচনায় মুখর। এসব অমুসলিম ব্যক্তিবর্গ বিশটি সাধারণ প্রশ্নের সাথে আরো ভুল ধারণা উদ্ভূত কিছু প্রশ্ন সংযোজন করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, তারা আল-কুরআনে পরস্পর বিরোধী কথা-বার্তা থাকার দাবি করে। তারা আরো দাবি করে যে, আল-কুরআন অবৈজ্ঞানিক। ইসলামকে যারা উল্লিখিত পক্ষপাত দুষ্ট উৎস থেকে জানার চেষ্টা করেছেন তাদের ভুল ধারণা নিরসনে বিশটি সাধারণ প্রশ্নের উত্তরের সাথে এখানে বাড়তি কিছু উত্তর সংযোজিত হয়েছে। আমি অবশ্য অমুসলিমদের জন্য অতিরিক্ত আরো বিশটি প্রশ্নের জবাব বিভিন্ন প্রসঙ্গে দিয়েছি।

১. বহু বিবাহ

প্রশ্ন ১। ইসলামে একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি কেন দেয়া হয়েছে? অর্থাৎ ইসলামে একাধিক বিবাহের বৈধতা কেন দেয়া হয়েছে?

উত্তর :

১. বহু বিবাহের সংজ্ঞা

'বহু বিবাহ' (Polygamy) অর্থ এমন এক বিবাহ পদ্ধতি যেখানে একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকে। বহু বিবাহ দু প্রকার হতে পারে। এক প্রকার হলো, (Polygamy) যেখানে একজন পুরুষ একাধিক মহিলাদের বিবাহ করে। অপরটি হলো (Polyandry) যখন একজন মহিলা একাধিক পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ইসলামে সীমিত পর্যায়ে 'বহু বিবাহ' অনুমোদিত। অথচ একজন নারীর জন্য একই সাথে একাধিক পুরুষকে বিবাহ করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

এবার আমি মূল কথায় আসছি। ইসলাম একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখার কেন অনুমোদন দিয়েছে?

২. 'আল-কুরআন'-ই পৃথিবীতে একমাত্র ঐশীগ্রন্থ, যে নির্দেশ করে, 'একটি মাত্র বিবাহ করো'।

আল-কুরআনই হলো একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যাতে এই সম্বন্ধে এ শব্দগুচ্ছ রয়েছে যে, 'একটি মাত্র বিবাহ করো'। এছাড়া আর কোনো ধর্মগ্রন্থে এমন নেই যাতে একটি মাত্র বিবাহ করার নির্দেশ রয়েছে। এক স্ত্রী গ্রহণ সম্পর্কে বেদ, রামায়ণ, মহাভারত,

গীতা, বাইবেল, তালমুদ প্রভৃতি ধর্ম গ্রন্থের যে কোনো একটি ধর্মগ্রন্থেও বহু বিবাহ বা স্ত্রীদের সংখ্যার ব্যাপারে কোনো প্রকার নির্দিষ্ট সীমা সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় নি। এসব ধর্মগ্রন্থ অনুসারে একজন পুরুষ যত ইচ্ছে বিবাহ করতে পারে। হিন্দু পুরোহিত ও খ্রিস্টান পাদ্রিগণ অনেক পরে স্ত্রীদের সংখ্যা 'এক'-এ সীমিত করে দিয়েছে।

অনেক হিন্দুধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব তাদের ধর্মগ্রন্থের অনুমোদন অনুসারে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেছেন। রামের পিতা রাজা দশরথের একাধিক স্ত্রী ছিল। একইভাবে ভগবান শ্রী কৃষ্ণেরও কয়েকজন স্ত্রী ছিল। আগেকার খ্রিস্টানদের জন্য যত ইচ্ছে স্ত্রী গ্রহণের অনুমোদন ছিল। কেননা বাইবেলে স্ত্রীদের সংখ্যার ব্যাপারে কোনো বিধি-নিষেধ ছিল না। মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে খ্রিস্টান পাদ্রিদগণ স্ত্রীদের সংখ্যা একজনে সীমিত করে দেয়।

ইহুদি ধর্মে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমোদন রয়েছে। তালমুদের বিধান অনুসারে আব্রাহাম অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর তিনজন স্ত্রী ছিল এবং সলেমান অর্থাৎ হযরত সুলায়মান (আ)-এর শতাধিক স্ত্রী ছিল। ইহুদি রাব্বী জারসম বেন ইয়াহুদাহ পর্যন্ত (৯৬০ খ্রি. থেকে ১০৩০ খ্রি.) বহু বিবাহের এধারা জারি ছিল। অতঃপর তিনি এর বিরুদ্ধে একটি ফরমান জারি করেন।

ইহুদি শেফারডিক সম্প্রদায় যারা মুসলিম দেশসমূহে বসবাস করে তারা বেশির ভাগ বহু বিবাহের এ প্রথাকে নিকট অতীতের ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চালু রাখে। তারপর ইসরাঈলের প্রধান রাব্বী একটি সংশোধনী বিধি জারির মাধ্যমে একের অধিক স্ত্রী রাখা নিষিদ্ধ করেন।

৩. হিন্দুরা মুসলমানদের চেয়ে অধিক বহুপত্নীক

১৯৭৫ সালে প্রকাশিত 'কমিটি অভ্ দ্য স্ট্যাটাস অভ্ উমেন ইন ইসলাম'-এর ৬৬ থেকে ৬৭ পৃষ্ঠায় এক প্রতিবেদন অনুযায়ী মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুদের মধ্যে বহু বিবাহের হার উল্লিখিত হয়েছে অধিক। ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত বছরগুলোতে দেখা গেছে হিন্দুদের মধ্যে শতকরা ৫.০৬ ভাগ হিন্দু বহুপত্নীক। অপরদিকে মুসলমানদের মধ্যে এ হার শতকরা ৪.৩১ ভাগ। ভারতীয় আইনের বিধান অনুসারে ভারতে কেবল মুসলমানদের একাধিক স্ত্রী রাখা অর্থাৎ বহু বিবাহ অনুমোদিত। ভারতে কোনো অমুসলিমের একাধিক স্ত্রী রাখা বেআইনি। বেআইনি হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুরা মুসলমানদের তুলনায় অধিক স্ত্রী গ্রহণ করে। আগে এ ব্যাপারে সেখানে কোনো বিধি-নিষেধই ছিল না। এমনকি হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলের জন্যই একাধিক স্ত্রী রাখা অনুমোদিত ছিল। ১৯৫৪ সালে 'হিন্দু বিবাহ আইন' পাস করার পর হিন্দুদের জন্য একের অধিক স্ত্রী রাখা বেআইনি ঘোষিত হয়। বর্তমান ভারতীয় আইনে একজন

হিন্দু পুরুষ কর্তৃক একাধিক স্ত্রী রাখা নিষিদ্ধ। কিন্তু এটা হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থের বিধান নয়।

এবার চলুন, ইসলাম একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমোদন কেন দিয়েছে তা বিশ্লেষণ করা যাক।

৪. আল-কুরআন সীমিত 'বহু বিবাহ'-কে অনুমোদন করে

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে ভূপৃষ্ঠে আল-কুরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যা নির্দেশ করে, 'কেবল একটি বিবাহ করো।' একথার সমর্থন রয়েছে কুরআন মাজীদের সূরা আন-নিসার এ আয়াতে–

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً ـ

অর্থ : তবে বিয়ে করে নাও নারীদের মধ্য থেকে যাকে তোমাদের পছন্দ হয় দুই, তিন কিংবা চারজন পর্যন্ত, কিন্তু যদি আশঙ্কা করো যে, তাদের মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে (বিয়ে করো)।

আল-কুরআন নাযিলের আগে বহুবিবাহের কোনো উর্ধ্বতম সীমা সংখ্যা ছিল না। অনেক লোক স্ত্রী-র সংখ্যার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা চালাতো, কেউ কেউতো শতাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতো। ইসলাম-ই চারজন স্ত্রী রাখার উর্ধ্বতম সীমা সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়। ইসলাম একজন পুরুষকে দুই, তিন অথবা চারজন পর্যন্ত স্ত্রী রাখার অনুমোদন দেয় এ শর্তে যে, সে (স্বামী) তাদের মধ্যে সুবিচার করতে সমর্থ হবে।

একই অধ্যায়ে তথা সূরা নিসার ১২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ ـ

অর্থ : আর তোমরা কখনো স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে পারবে না ...।

সুতরাং বহু বিবাহ কোনো বিধিবদ্ধ বিধান নয় বরং একটি ব্যতিক্রমী বা বিকল্প ব্যবস্থা মাত্র। অনেক লোকই এ ভুল ধারণায় রয়েছে যে, একজন মুসলিম পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী রাখা একটি বাধ্যতামূলক বিধান।

এটা স্পষ্ট যে, ইসলামে 'করো' বা 'করো না' অর্থাৎ আদেশ সম্পর্কিত বিষয়গুলো ৫টি শ্রেণীতে বিন্যস্ত। যথা :

১. ফরজ অর্থাৎ অবশ্য পালনীয় যা বাধ্যতামূলক।

২. মুস্তাহাব অর্থাৎ অনুমোদিত অথবা উৎসাহিত।

৩. মুবাহ অর্থাৎ অনুমোদনযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য।

৪. মাকরূহ অর্থাৎ অনানুমোদিত বা নিরুৎসাহিত।

৫. হারাম বা বে-আইনি অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

'বহু বিবাহ' এ শ্রেণীবিভাগের মধ্যে মধ্যম বা তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। অর্থাৎ বহু বিবাহ ইসলামী বিধানে অনুমোদনযোগ্য বা বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণযোগ্য। এটা সরাসরি বলা সঙ্গত হবে না যে, মুসলিমের তিন বা চার জন স্ত্রী আছে, বরং বলা উচিত, যার একাধিক স্ত্রী আছে, তার চেয়ে ঐ ব্যক্তি উত্তম যার একজন স্ত্রী আছে।

৫. পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের গড় আয়ু অধিক

প্রকৃতিগতভাবে নারী ও পুরুষের জন্ম হার প্রায় সমান। একটি পুরুষ শিশুর চেয়ে একটি নারী শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। একটি নারী শিশু রোগ-জীবাণু ও বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির সাথে বেশি লড়াই করতে পারে। আর এ জন্যই মেয়ে শিশুদের তুলনায় ছেলে শিশুদের মৃত্যুর হার বেশি।

যুদ্ধকালীন অবস্থায় নারীদের তুলনায় পুরুষরাই অধিক হারে নিহত হয়। দুর্ঘটনায় এবং বিভিন্ন রোগ-ব্যাধিতে নারীদের চেয়ে পুরুষদের মৃত্যু বেশি হয়। এসব কারণে পুরুষদের তুলনায় নারীদের গড় আয়ু বেশি এবং কালের যে কোনো যুগে বিপত্নীক পুরুষদের চেয়ে বিধবাদের সংখ্যা অধিক খুঁজে পাওয়া যায়।

৬. ভারতে নারী শিশুর ভ্রূণ হত্যা এবং নারী শিশু হত্যার কারণে পুরুষ জনসংখ্যা নারী জনসংখ্যার চেয়ে অধিক

পরস্পর প্রতিবেশী কয়েকটি রাষ্ট্রের মধ্যে ভারতই একমাত্র রাষ্ট্র যেখানে পুরুষ জনসংখ্যার চেয়ে নারী জনসংখ্যা কম। ভারতে উচ্চহারে নারী শিশু হত্যার মধ্যেই এর কারণ নিহিত এবং প্রকৃত সত্য হলো, অভিশপ্ত যৌতুক প্রথার কারণে ভ্রূণ চিহ্নিত করে এ দেশে প্রতিবছর কমপক্ষে দশ লক্ষ নারী শিশুর ভ্রূণ গর্ভপাত করে ফেলা হয় এ অশুভ প্রবণতা যদি বন্ধ করা যায় তা হলে দেখা যাবে যে, ভারতেও পুরুষদের তুলনায় নারীদের সংখ্যা বেশি হয়ে গেছে।

৭. বিশ্বে পুরুষ জনসংখ্যার তুলনায় নারী জনসংখ্যা অধিক

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পুরুষদের তুলনায় নারীর সংখ্যা ৭.৮ মিলিয়ন অর্থাৎ ৭০ লক্ষ ৮০ হাজার বেশি। নিউ ইর্য়ক শহরে পুরুষদের তুলনায় নারীর সংখ্যা দশ লক্ষ বেশি এবং এ পুরুষ জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ আবার সমকামী অর্থাৎ এরা কোনো নারীর সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী নয়। সমগ্র আমেরিকাতে ২৫ লক্ষ অর্থাৎ ২ কোটি ৫০ লক্ষের বেশি সমকামী রয়েছে। এর অর্থ এ লোকগুলো কোনো নারীকে

বিয়ে করতে আদৌ ইচ্ছুক নয়। গ্রেট বৃটেনে পুরুষদের অপেক্ষা ৪০ লক্ষ নারী বেশি রয়েছে। জার্মানিতে পুরুষদের তুলনায় নারীর সংখ্যা ৫০ লক্ষ বেশি। রাশিয়াতে পুরুষদের চেয়ে নারীর সংখ্যা ৯০ লক্ষ বেশি। এমনকি আমাদের বাংলাদেশের নারীদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় শতকরা সাত ভাগ বেশি। সারা বিশ্বে পুরুষদের তুলনায় নারীর সংখ্যা কত বেশি হবে, তা একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন।

৮. 'একজন পুরুষের জন্য এক স্ত্রী'— প্রত্যেকের জন্য এমন বিধি আরোপ করা বাস্তব সম্মত নয়

একজন পুরুষ কেবল একজন স্ত্রী গ্রহণ করলে একমাত্র আমেরিকাতেই তিন কোটি নারীর ভাগ্যে কোনো স্বামী জুটবে না (মনে রাখতে হবে যে, আমেরিকাতে ২ কোটি ৫০ লক্ষ সমকামী পুরুষ রয়েছে)। এমনিভাবে গ্রেট বৃটেনে ৪০ লক্ষ, জার্মানিতে ৫০ লক্ষ এবং রাশিয়াতে ৯০ লক্ষ নারী উল্লিখিত বিধান জারির ফলে কোনো স্বামী পাবে না।

মনে করুন, আমার বোন আমেরিকায় বসবাসকারী একজন অবিবাহিতা মহিলা, অথবা আপনার বোন আমেরিকায় বসবাসকারী একজন অবিবাহিতা মহিলা। তার সামনে দুটো পথ খোলা আছে এবং তাকে হয়তো এমন একজন পুরুষকে বিয়ে করতে হবে যার একজন স্ত্রী আছে। অথবা সে গণ সম্পদে পরিণত হতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। যে কোনো রুচিবান নারী প্রথমটিই গ্রহণ করবে। অর্থাৎ যে পুরুষের একজন স্ত্রী রয়েছে, তার দ্বিতীয় স্ত্রী হতে আপত্তি করবে না।

পশ্চিমা সমাজে একজন পুরুষের একাধিক নারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা একটি সাধারণ ব্যাপার; অথবা একাধিক বিবাহ বহির্ভূত যৌনাচার সেখানে একান্তই স্বাভাবিক। আর এজন্যই সেখানে নারীরা অতৃপ্ত ও যৌন নিরাপত্তাহীন জীবনযাপন করে। অথচ এই একই সমাজ একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকার ব্যাপারকে গ্রহণ করতে পারে না। যেখানে হতে পারতো নারী তার সমাজে সম্মানজনক ও মর্যাদার অধিকারিণী এবং যাপন করতো নিরাপদ জীবন।

যা হোক, যেখানে নারীকে এমন দুটো ব্যবস্থার একটাকে গ্রহণ করতে হবে যে দুটোর কোনো বিকল্প নেই। হয়তো তাকে একজন বিবাহিত পুরুষকে বিয়ে করতে হবে যার একজন স্ত্রী আগে থেকে আছে, অথবা তাকে গণ সম্পত্তিতে পরিণত হতে হবে। এ অবস্থায় ইসলাম নারীকে সম্মানজনক প্রথম ব্যবস্থাটাকেই গ্রহণের অনুমতি দান করে, দ্বিতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতি দেয় না। ইসলাম যে সীমিতআকার 'বহু বিবাহ'-কে অনুমোদন দেয় তার আরো কারণ রয়েছে। তবে এর প্রধান উদ্দেশ্য নারীর সম্মান-সম্ভ্রমকে রক্ষা করা।

২. একাধিক স্বামী গ্রহণ

প্রশ্ন ২। একজন পুরুষকে যখন একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে, তখন একজন নারীকে একাধিক স্বামী গ্রহণে ইসলাম বাধা দেয় কেন?

উত্তর : বেশ কিছু লোক যাদের মধ্যে কিছু মুসলিমও রয়েছেন— যারা এ বিষয়ের তাৎপর্য সম্পর্কে প্রশ্ন করেন যে, ইসলাম যেখানে একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয়, সেখানে একজন নারীকে একই অধিকার দিতে অস্বীকৃতি জানায় কেন? এখানে বলে নেয়া আবশ্যক যে, একটি ইসলামি সমাজের ভিত্তি সাম্য ও ন্যায়বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তাআলা নারী ও পুরুষকে সমানভাবে সৃষ্টি করেছেন তবে সামর্থ্য, যোগ্যতা ও দায়িত্বের ভিন্নতা দিয়ে। শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কাজের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ও দায়িত্বে পার্থক্য রয়েছে। ইসলামে নারী ও পুরুষ সমান কিন্তু অভিন্ন নয়।

কুরআন মাজীদের সূরা আন-নিসার ২২ নং থেকে ২৪ নং আয়াতে যেসব নারীর একটি তালিকা দেয়া হয়েছে, যাদেরকে বিবাহ করা একজন মুসলিম পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ। এরপরে ২৪ নং আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে যে,

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ -

অর্থ : অন্য পুরুষের বিবাহাধীন স্ত্রী-ও এ নিষেধের তালিকায় রয়েছে।

একজন নারীর একই সাথে একাধিক স্বামী গ্রহণ কেন নিষিদ্ধ তার কারণগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো :

১. একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকলেও তাদের পরিবারে জন্ম লাভকারী শিশুর পিতা কে তা চিহ্নিত করতে কোনো বেগ পেতে হয় না। পিতৃপরিচয় যেমন সহজেই পাওয়া যায় তেমনি মাতৃপরিচয়ও সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু একজন নারীর একাধিক স্বামী থাকার ক্ষেত্রে সন্তানের মাতৃপরিচয় সহজেই পাওয়া গেলেও পিতৃ পরিচয় পাওয়া সহজ নয়। মাতা ও পিতা উভয়ের পরিচয়ের ব্যাপারটাতো ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে। বর্তমানকালে মনোবিজ্ঞানীরা (Psychologist) বলেন যে, যেসব শিশু তাদের মাতা-পিতার পরিচয় জানে না তারা তীব্র মানসিক যন্ত্রণা ও হীনমন্যতায় ভোগে। তাদের শিশুকাল কাটে অসুখীভাবে। এ কারণেই দেহোপজীবিনী বা বেশ্যাদের সন্তানদের শিশুকাল সুখময় হয় না। একাধিক স্বামী গ্রহণকারী নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের স্কুলে ভর্তি করতে গেলে যদি সে নারীকে শিশুর পিতার নাম জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহলে তাকে দুই বা ততোধিক নাম

বলতে হবে। আমি জানি যে, বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মাতা ও পিতার উভয়কে সনাক্ত করাটা পরীক্ষার মাধ্যমে সম্ভব। তাই এ পয়েন্টটি অতীতের জন্য প্রযোজ্য হলেও বর্তমানকালের জন্য প্রযোজ্য না-ও হতে পারে।

২. প্রকৃতিগতভাবে নারীর চেয়ে পুরুষ বহুপত্নীক হবার ব্যাপারে অধিক যোগ্য।

৩. জৈবিক দিক থেকে একজন পুরুষ তার একাধিক স্ত্রীর প্রতি তার কর্তব্য সহজেই পালন করতে পারে। কিন্তু একজন নারীর একাধিক স্বামী থাকা অবস্থায় স্ত্রী হিসেবে তার দায়িত্ব কর্তব্য পালন সহজ নয়। একজন নারীকে তার মাসিক ঋতু স্রাবকালীন অবস্থায় ভিন্ন মানসিক ও আচরণগত সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। কারণ এ সময় তার মধ্যে মানসিক ও আচরণগত পরিবর্তন আসে।

৪. একাধিক স্বামীর স্ত্রীকে একই সাথে কয়েক জনের যৌনসঙ্গী হতে হয়। এ পরিস্থিতিতে তার বিভিন্ন মারাত্মক রোগের আক্রমণের শিকার হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে যা যৌনাচারের মাধ্যমে তার অন্য স্বামীদের মধ্যেও সংক্রমিত হতে পারে। এমন কি যদি তার স্বামীদের অন্য কোনো নারীর সাথে বিবাহ বহির্ভূত যৌনসম্পর্ক না-ও থেকে থাকে। পক্ষান্তরে একাধিক স্ত্রীর স্বামীর জন্য এ জাতীয় সংক্রমণের আশঙ্কা নেই, যদি তার স্ত্রীদের কারো সাথে বিবাহ বহির্ভূত অন্য কোন পুরুষেরযৌন সম্পর্ক না থাকে।

এখানে উল্লিখিত কারণগুলো একজন লোক খুব সহজেই চিহ্নিত করতে এবং বুঝতে সক্ষম। এছাড়া আরো অনেক কারণ থাকতে পারে, যেজন্য অনন্ত অসীম জ্ঞানের আধার মহান আল্লাহ নারীদের জন্য একই সাথে একাধিক স্বামী গ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছেন।

৩. হিজাব বা নারীর পর্দা

প্রশ্ন ৩। ইসলাম পর্দা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দ্বারা নারীকে অবমূল্যায়ন করেছে কেন?

উত্তর : সেকুলার তথা ধর্মহীন প্রচার মাধ্যমগুলোর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল প্রায়ই ইসলামে নারীর মর্যাদা সম্পর্কিত বিষয় হয়ে থাকে। ইসলামি বিধি বিধানে নারী নিগ্রহের বড় প্রমাণ হিসেবে প্রায়ই হিজাব বা ইসলামি পোশাককে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। নারীর জন্য 'হিজাব' তথা ইসলামি পোশাক প্রবর্তনের পেছনে ধর্মীয় কারণগুলো বিশ্লেষণের আগে ইসলামের সক্রিয় আগমনের পূর্বে তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান কীরূপ ছিল তা আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন।

১. ইসলাম-পূর্বকালে সমাজে নারী ছিল অত্যন্ত মূল্যহীন এবং তারা ভোগ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতো

ইতিহাস থেকে সংগৃহীত নিম্নে বর্ণিত উদাহরণগুলোর মাধ্যমে আমাদের সামনে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে যে, অতীতের সভ্যতাগুলোতে নারীর মর্যাদা কীরূপ ছিল। ইসলাম-পূর্ব তৎকালীন সমাজে নারীর মর্যাদা বলতে কিছুই ছিল না। এমনকি তাদেরকে ন্যূনতম মানবিক মর্যাদা দিতেও তারা অস্বীকৃত ছিল।

ক. ব্যাবিলনীয় সভ্যতা : ব্যাবিলনীয় আইনে নারী ছিল নিতান্ত মূল্যহীন। যাবতীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত নারীদের অবস্থা এমন ছিল যে, কোনো পুরুষ যদি কোনো নারীকে হত্যার অপরাধে অপরাধী হতো, তা হলে সেই পুরুষের পরিবর্তে তার স্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো।

খ. গ্রিক সভ্যতা : প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে গ্রিক সভ্যতাকে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতা হিসেবে ইতিহাসে স্থান দেয়া হয়েছে। তথাকথিত এই গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতায় নারীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত নিচে এবং সর্বপ্রকার অধিকার থেকে তারা ছিল বঞ্চিত। তাদেরকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখা হতো। গ্রিক পুরাণে উল্লিখিত 'প্যানডোরা' নামীয় কাল্পনিক নারীকে মানবজাতির সকল দুর্ভাগ্যের মূল বলে উল্লেখ করা হয়। গ্রিক জাতি নারীকে যদিও অপূর্ণাঙ্গ মানুষ তথা মানুষের চেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী বলে মনে করতো। নারীর সতীত্ব অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। এক নারীকে গ্রিকরা দেবীর আসনে বসিয়ে পূজো করতো। কিন্তু কিছুকাল পরেই আত্মঅহঙ্কারে মেতে উঠে অবাধ যৌনাচার সংস্কৃতিতে তারা ডুবে যায়। এমনকি গ্রিক সমাজের সর্বস্তরের মানুষ বেশ্যালয়ে যেতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে এবং এটা সর্বশ্রেণীর মানুষের সংস্কৃতিতে পরিণত হয়।

গ. রোমান সভ্যতা : রোমান সভ্যতা যখন তার উন্নতির উচ্চ শিখরে অবস্থান করছিল, তখন নারীর প্রতি আচরণ এমন ছিল যে, একজন পুরুষ যখন ইচ্ছে তার স্ত্রীকে হত্যা করতে পারতো। নগ্নতা ও বেশ্যালয়ে যাতায়াত রোমানদেরও সাধারণ সংস্কৃতিতে পরিণত হয়ে উঠেছিল।

ঘ. মিসরীয় সভ্যতা : মিসরীয় সভ্যতায় নারীকে 'অলক্ষুণে এক শয়তানের চিহ্ন' বলে গণ্য করতো।

ঙ. ইসলাম পূর্ব আরব : আরবে ইসলাম আবির্ভাবের আগে নারীকে তারা অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতো এবং নারী-শিশু জন্মগ্রহণ করলে তাকে জীবিত কবর দেয়া হতো।

২. ইসলাম নারীকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছে এবং তাদেরকে দিয়েছে সাম্য আর আশা করে যে, তারা তাদের মর্যাদা ধরে রাখবে।

ইসলাম নারীর মর্যাদাকে উর্ধ্বে তুলেছে এবং ১৪ শত বছর আগে তাদের ন্যায্য অধিকার দিয়েছে।

পুরুষের জন্য পর্দা : পর্দার আলোচনায় মানুষ সাধারণত নারীদের পর্দার কথাই বলে। যা হোক কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা নারীদের পর্দার কথা আলোচনার আগে সূরা নূরে বলেন—

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ـ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ـ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ـ

অর্থ : (হে নবী!) আপনি মু'মিন পুরুষদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে। এটা তাদের জন্য উত্তম। অবশ্যই তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত। (সূরা নূর : ৩০)

নারীর প্রতি পুরুষদের দৃষ্টি পড়লে কোনো অসঙ্গত ও নির্লজ্জ চিন্তা তার মনে এসে যেতে পারে। সেজন্য তার দৃষ্টিকে অবনত রাখা উচিত।

নারীর জন্য পর্দা : সূরা নূর -এর ৩১ নং আয়াতে বলা হয়েছে —

قُلْ لِلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ .....

অর্থ : আর (হে নবী!) আপনি মু'মিনাদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে; আর সাধারণভাবে প্রকাশিত থাকে তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে; আর তারা যেন তাদের চাদর নিজ বুকের ওপর জড়িয়ে রাখে এবং তারা যেন নিজেদের সৌন্দর্য কারো কাছে প্রকাশ না করে, এদের ছাড়া–তাদের স্বামী, তাদের পিতা, তাদের শ্বশুর, তাদের পুত্র...।

৩. 'হিজাব' বা পর্দার ৬টি শর্ত

ক. সীমানা : প্রথম শর্ত হলো দেহের যে সীমা পর্যন্ত তাকানো যাবে তা। নারী ও পুরুষের এ সীমায় পার্থক্য রয়েছে। পুরুষের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ হলো কমপক্ষে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে ঢেকে রাখতে হবে। আর নারীর ক্ষেত্রে এ সীমা হলো কব্জি পর্যন্ত হাত ও মুখমণ্ডল ছাড়া সমস্ত শরীর বাধ্যতামূলকভাবে ঢেকে রাখতে হবে। তবে তারা যদি চায় হাত ও মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতে পারে। ইসলামি জ্ঞানে বিশেষজ্ঞদের অনেকেই হাত ও মুখমণ্ডলকেও বাধ্যতামূলক ঢেকে রাখার পক্ষপাতি। তারা এ দুটো অংশকেও 'হিজাব' বা পর্দার আওতাভুক্ত মনে করেন।

বাকি ৫টি শর্ত পুরুষ ও নারীর জন্য সমান

খ. পোশাক পরিধেয় পোশাক ঢিলেঢালা হতে হবে, যেন শরীরের কাঠামো প্রকাশ না পায়।

গ. পোশাক এমন স্বচ্ছ বা পাতলা হবে না, যাতে পোশাকের ঢেকে রাখা অংশ দেখা যায়।

ঘ. বিপরীত লিঙ্গ আকর্ষিত হয় এমন জাঁকজমকপূর্ণ আকর্ষণীয় পোশাক হবে না।

ঙ. পোশাক বিপরীত লিঙ্গের পোশাকের মতো হতে পারবে না। অর্থাৎ নারী পুরুষের মতো এবং পুরুষ নারীর মতো পোশাক পরতে পারবে না।

চ. পোশাক অবিশ্বাসীদের পোশাকের মতো হতে পারবে না। অর্থাৎ এমন পোশাক পরা যাবে না যা অন্য ধর্মালম্বীদের পরিচয় বহন করে। অথবা যে পোশাক অন্য ধর্মের তথা অবিশ্বাসীদের জাতীয় প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত এমন পোশাক পরা যাবে না।

৪. ভাব-ভঙ্গি এবং আচার-আচরণও 'হিজাব' বা পর্দার অন্তর্গত বিষয়

পোশাক সম্বন্ধীয় ছয়টি শর্তের পাশাপাশি ব্যক্তিকে নৈতিক চরিত্র, আচার-আচরণ, ভাব-ভঙ্গি ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ওপরও পূর্ণাঙ্গ পর্দা নির্ভরশীল হতে হবে। একজন ব্যক্তি পোশাক সংক্রান্ত পর্দার শর্তগুলো পূরণ করলে সীমিত অর্থেই পর্দা পালন করলো। পোশাকের সাথে সাথে চোখের পর্দা, মনের পর্দা, চিন্তা-চেতনার পর্দা এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পর্দাও থাকতে হবে। এর সাথে ব্যক্তির চলাফেরা, কথা-বার্তা এবং আচার-আচরণ ইত্যাদিও পর্দাও শামিল হয়।

৫. 'হিজাব' বা পর্দা উৎপীড়ন প্রতিরোধ করে

নারীর জন্য 'হিজাব' বা পর্দার বিধান দেয়ার কারণ কুরআন মাজীদে সূরা আল-আহযাবের নিম্ন বর্ণিত আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে —

يَـٰٓأَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَـٰبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ـ

অর্থ : হে নবী! আপনি আপনার পত্নীদেরকে আপনার কন্যাদেরকে মুমিনদের নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন ওড়না নিজেদের ওপর টেনে দেয়। এতে সহজেই তাদের পরিচয় পাওয়া যাবে। ফলে তারা নির্যাতিতা হবে না। আর আল্লাহতো অতিশয় ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (সূরা আহযাব : আয়াত ৫৯)

পবিত্র আল-কুরআন বলে যে, নারীদের জন্য 'হিজাব' বা পর্দার বিধান এজন্য দেয়া হয়েছে তারা যেন সম্ভ্রান্ত মহিলা হিসেবে পরিচিত হয়। ফলে নির্যাতন থেকে রেহাই পাবে।

৬. যমজ দু' বোনের দৃষ্টান্ত

ধরে নেয়া যাক দু বোন যমজ। উভয়ই সমানভাবে সুন্দরী। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে উভয়ে। তাদের একজন ইসলামি হিজাবে আবৃতা; অর্থাৎ কব্জি পর্যন্ত হাত এবং মুখমণ্ডল ছাড়া তার সারা শরীর ঢাকা। অপরজন পশ্চিমা পোশাক, একটি মিনি স্কার্ট অথবা শর্টস্ পরিহিতা। সামনে রাস্তার ওপারে কয়েকজন বদমাশ ছেলে কোনো মেয়েকে উত্যক্ত করার জন্য ওঁত পেতে বসে আছে। এখন বলুনতো সে কাকে উত্যক্ত করবে? যে মেয়েটি ইসলামী 'হিজাব' পরিহিতা তাকে, না-কি যে মেয়েটি পশ্চিমা পোশাক মিনি স্কার্ট বা শর্টস্ পরিহিতা তাকে? স্বাভাবিকভাবেই গুণ্ডাগুলো পশ্চিমা পোশাক পরিহিতা মেয়েটিকেই উত্যক্ত করবে। এ ধরনের পোশাক পরোক্ষভাবে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি পোশাক পরিহিতার নিজেকে উত্যক্ত করা এবং নির্যাতন করার আমন্ত্রণ বলা যায়। আল-কুরআন যথার্থই বলেছে যে, 'হিজাব' নারীকে পুরুষের নির্যাতন থেকে রক্ষা করে।

৭. ধর্ষকের চরম শাস্তি মৃত্যুদণ্ড

ইসলামি শরীয়াহ আইনে কোনো পুরুষ যদি ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত হয় এবং আদালতে সেই অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তাহলে তার শাস্তি প্রকাশ্য মৃত্যুদণ্ড। এ কঠিন কথা শুনে অনেকে অবাক হয়ে যান। কেউ কেউ বলেই ফেলেন যে, ইসলাম একটি নিষ্ঠুর এবং বর্বর ধর্ম। আমি শত শত অমুসলিম পুরুষের কাছে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে জানতে চেয়েছি যে, ধরেন আল্লাহ না করুন, কোনো বদমাশ আপনার স্ত্রী, আপনার মাতা বা বোনকে ধর্ষণ করেছে। আপনি বিচারকের আসনে আসীন। অপরাধীকে আপনার সামনে আনা হয়েছে। আপনি তাকে কী শাস্তি দেবেন? এ প্রশ্নের

উত্তরে সবাই বলেছে যে, তারা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন। তাদের কেউ কেউ বাড়িয়ে এতোটুকু বলেছেন যে, তারা তাকে নির্যাতন চালিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবেন। তাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করেছি যে, কেউ আপনার স্ত্রী বা মাতাকে ধর্ষণ করলে তাকে আপনি মৃত্যুদণ্ড দেবেন, কিন্তু একই অপরাধ যদি অন্যদের স্ত্রী বা কন্যার উপর সংঘটিত হয়, তখন আপনি মৃত্যুদণ্ডের শাস্তিকে বলবেন বর্বরতা, একই অপরাধ দু রকম বিচার কেন?

৮. নারীকে উচ্চ মর্যাদা দেয়ার পশ্চিমা দাবি একেবারে মিথ্যা

নারীকে স্বাধীনতা দেয়ার পশ্চিমাদের দাবি মূলত নারীদেরকে পেষণ, তার আত্মার অবমাননা এবং তার সম্মান মর্যাদাকে ধ্বংস করে দেয়ার একটি ছল ও প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়। পশ্চিমা সমাজ দাবি করে যে, তারা নারীকে ঊর্ধ্বে উঠিয়েছে। আর বাস্তবতা হলো তারা নারীকে তাদের মর্যাদা থেকে নামিয়ে উপপত্নী, রক্ষিতা ও মক্ষীরাণী বানিয়ে ছেড়েছে। তারা নারীদেরকে বিলাসী পুরুষদের ভোগের উপকরণ ও যৌন ব্যবসায়ীদের সস্তা পণ্যে পরিণত করেছে যা শিল্প সংস্কৃতির রঙিন পর্দা দ্বারা আড়াল করা হয়েছে।

৯. বিশ্বে নারী ধর্ষণের হার আমেরিকাতে সর্বোচ্চ

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে মনে করা হয়। অবশ্য বিশ্বের মধ্যে নারী ধর্ষণের সর্বোচ্চ হারও আমেরিকাতে। ১৯৯০ সালের এফ.বি.আই. (F.B.I.) রিপোর্ট অনুযায়ী কেবল আমেরিকাতেই গড়ে দৈনিক ১,০৫৬টি ধর্ষণজনিত অপরাধ সংঘটিত হয়। পরবর্তীতে অন্য একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, আমেরিকাতে গড়ে প্রতিদিন ১,৯০০ ধর্ষণের ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়। রিপোর্টটিতে সাল উল্লিখিত হয় নি। তবে সম্ভবত তা ১৯৯২ বা ১৯৯৩ সাল হবে। সম্ভবত উল্লিখিত বছরগুলোতে আমেরিকানরা আরো অধিক হিংস্র হয়ে উঠেছে।

আসুন একটা চিত্রনাট্য অঙ্কন করা যাক। যেখানে দেখা যাবে যে, আমেরিকাতে 'ইসলামি হিজাব' অনুসৃত হচ্ছে। যখনই কোনো পুরুষ কোনো নারীর দিকে তাকাচ্ছে এবং তার মনে কোনো অসৎ অশ্লীল চিন্তা আসতে পারে মনে করে তখনই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছে। প্রত্যেকটি নারী 'ইসলামি হিজাব' তথা পর্দার বিধান অনুসরণ করছে অর্থাৎ প্রত্যেক নারী মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হাত ছাড়া সমস্ত শরীর ঢেকে রাস্তায় বের হচ্ছে। এর পরেও কোনো অসৎ পুরুষ ধর্ষণের মতো অপরাধ করলে ইসলামের দণ্ডবিধান অনুযায়ী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান তার ওপর বলবৎ করা হচ্ছে। আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই, এ দৃশ্য পটে যে চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে এমন একটা পরিবেশে আমেরিকাতে ধর্ষণের ঘটনা কি বাড়বে, একই সমান থাকবে, নাকি কমবে?

১০. ইসলামি শরীআহ আইন বলবৎ হলে ধর্ষণের হার অবশ্যই কমে আসবে

ইসলামি শরীআহ আইন কার্যকর হলে তার ফলাফল অবশ্যই ইতিবাচক হবে এবং অপরাধের হার আশাতীতভাবে কমে যাবে। বিশ্বের যে কোনো দেশে ইসলামের শরীআহ আইন কার্যকর হলে, তা আমেরিকা হোক বা ইউরোপের অন্য কোনো দেশ হোক, সমাজে বসবাসকারীরা মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। 'হিজাব' বা পর্দা নারীকে অবমূল্যায়ন করে না বরং নারীকে যথার্থ মূল্যায়নের মাধ্যমে নারীর মর্যাদা উর্ধ্বে তুলে ধরে এবং তার সতীত্ব সম্ভ্রমকে সুরক্ষা করে।

৪. ইসলাম কি তরবারির জোরে প্রসার লাভ করেছে?

প্রশ্ন ৪: ইসলামকে শান্তির ধর্ম কীভাবে বলা যায়, অথচ তা প্রসার লাভ করেছে তরবারির জোরে?

উত্তর : কিছু কিছু অমুসলিমের একটি সাধারণ অভিযোগ যে, ইসলাম বিশ্বব্যাপী এতো কোটি কোটি অনুসারী পেতে সক্ষম হতো না, যদি তা শক্তি প্রয়োগে প্রসার লাভ না করতো। নিচের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, ইসলাম তরবারির সাহায্যে প্রসার ভয় দেখিয়ে লাভ করে নি। বরং এটা ছিল সত্যের স্বাভাবিক ও সহজাত প্রভাব, কার্যকারণ ও মানব-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল যৌক্তিকতা যা ইসলামকে দ্রুত প্রসার লাভে সহায়তা দান করেছে।

১. ইসলাম অর্থ শান্তি

'ইসলাম' শব্দের মূল উৎস শব্দ হলো 'সালাম' যার অর্থ শান্তি। আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ এর অপর অর্থ। সুতরাং ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম যা অর্জিত হয় সার্বভৌম স্রষ্টা আল্লাহর ইচ্ছের কাছে স্বীয় ইচ্ছেকে সমর্পণ করার মাধ্যমে।

২. শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় কখনো কখনো শক্তি প্রয়োগ করতে হয়

এ বিশ্বের সকল মানুষই শান্তি-শৃঙ্খলার পক্ষে নয়। এখানে অনেক মানুষ আছে যারা নিজেদের হীন স্বার্থে শান্তি-শৃঙ্খলায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তাই কখনো কখনো শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। আর এ সুনির্দিষ্ট কারণেই আমাদের পুলিশ বাহিনী রয়েছে যারা দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে দুষ্কৃতকারী ও সমাজ বিরোধী লোকদের বিরুদ্ধে শক্তি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। ইসলাম শান্তির প্রযোজক, সাথে সাথে ইসলাম তার অনুসারীদেরকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করে। যুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে অনেক সময় শক্তি প্রয়োগ করতে হয় বা শক্তি প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ইসলামে শুধু শান্তি-শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার খাতিরেই শক্তি প্রয়োগ করার বৈধতা রয়েছে।

৩. বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ডি ল্যাসী ও ল্যারী-এর মতামত

ইসলাম তরবারির জোরে প্রসার লাভ করেছে– এ ভুল ধারণার উত্তম জবাব দিয়েছেন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ডি ল্যাসী ও ল্যারী (De Lecy o, Leary)। তিনি তাঁর রচিত 'ইসলাম এট দি ক্রস রোড' (Islam at the cross road) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে উল্লিখিত অভিযোগের এ জবাব দিয়েছেন–

"অবশেষে ইতিহাসই এটাকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছে। ইসলামকে নিয়ে ধর্মান্ধ মুসলমানরা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এবং ইসলামকে তরবারির অগ্রভাগে নিয়ে বিজিত জাতিগুলোকে তা মানাতে বাধ্য করেছে– এ প্রচারণা অনেকের মধ্যে একটি কল্পনাপ্রসূত, উদ্ভট ও অবাস্তব কাহিনী যা ইতিহাসবিদগণ বারবার বলে বেড়াচ্ছেন।"

৪. স্পেনে আটশত বছর মুসলিম শাসন ছিল

মুসলমানরা আটশত বছর স্পেন শাসন করেছে। সেখানে মুসলমানরা কখনো তরবারির সাহায্যে কোনো লোককে ধর্মান্তরিত করে নি। পরবর্তীতে খ্রিস্টান ক্রুসেডাররা স্পেনে আসে এবং মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। অতঃপর সেখানে এমন একজন মুসলমানও বেঁচে ছিল না, যে প্রকাশ্যে নামাযের জন্য আযান দিতে পারতো।

৫. এক কোটি চল্লিশ লক্ষ আরব মিসরীয় খ্রিস্টান

মুসলমানরা সমগ্র আরব ভূ-খণ্ডের ১৪০০ বছর মালিক ছিল। মাঝখানে কয়েক বছর ব্রিটিশ শাসন এবং কয়েক বছর ছিল ফরাসি শাসন। মুসলমানরাই আরব ভূ-খণ্ড শাসন করেছে ১৪০০ বছর। অথচ আজো সেখানে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ আরবীয় খ্রিস্টান বংশানুক্রমে বসবাস করছে। মুসলমানরা যদি তরবারি তথা শক্তি প্রয়োগ করতো তাহলে সেখানে একজন আরবও খ্রিস্টান থাকতে পারতো না।

৬. ভারতে শতকরা ৮০ ভাগের বেশি অমুসলিম রয়েছে

মুসলমানরা আনুমানিক এক হাজার বছর ভারত শাসন করেছে। তারা চাইলে এবং তাদের ক্ষমতাও ছিল ভারতের প্রত্যেকটি অমুসলিমকে শক্তি প্রয়োগ করে ধর্মান্তরিত করতে পারতো। অথচ আজো শতকরা ৮০ ভাগের অধিক অমুসলিম ভারতে বহাল তবিয়তে আছে। এ অমুসলিম ভারতীয়রা আজো সাক্ষী যে, মুসলমানরা তরবারির জোরে ইসলামকে প্রসারিত করে নি।

৭. ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়া

ইন্দোনেশিয়া এমন একটি দেশ যেখানে বিশ্বের সবচেয়ে অধিক মুসলমান বাস করে। মালয়েশিয়ার মেজরিটি অধিবাসী মুসলমান। যে কেউ প্রশ্ন করতে পারে কোন্ মুসলিম সেনাবাহিনী উল্লিখিত দুটো দেশে গিয়েছিল?

৮. আফ্রিকার পূর্ব উপকূল

একইভাবে ইসলাম অত্যন্ত দ্রুত আফ্রিকার পূর্ব উপকূলীর অঞ্চলে প্রসার লাভ করেছে। যে কেউ আবার প্রশ্ন ছুঁড়তে পারে যে, ইসলাম যদি তরবারির জোরে প্রসার লাভ করে থাকে, তাহলে 'আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে কোন্ মুসলিম সেনাবাহিনী গিয়েছিল?'

৯. টমাস কার্লাইল

বিখ্যাত ইতিহাসবিদ টমাস কার্লাইল তাঁর রচিত 'হিরোজ অ্যান্ড হিরো ওয়ার্শিপ' (Heroes and Hero worship) গ্রন্থে ইসলামের প্রসার লাভ সংক্রান্ত ব্যাপারে বিভ্রান্তি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছেন– "তরবারি! কিন্তু কোথায় তুমি আমার তরবারি পাবে? সকল মতাদর্শই সূচনায় একজনের সংখ্যালঘু থাকে। মাত্র একজন মানুষের মাথায় তা থাকে। সেখানেই তা থাকে। নিখিল বিশ্বে মাত্র একজনই তা বিশ্বাস করে, একক একজন মানুষ সমগ্র মানুষের বিরুদ্ধে। সেই মানুষটি একটি তরবারি নিল এবং তা দ্বারা তার মতাদর্শ প্রচার করার চেষ্টা চালায়। তাতে তার সামান্যতম কাজ হয়েছে কি? তোমার তরবারি তোমার নিজেকেই খুঁজে পেতে হবে। মোটকথা কোনো জিনিস যেমনভাবে সে পারে নিজে নিজেই প্রচারিত হবে।"

১০. দ্বীনের ব্যাপারে জোর জবরদস্তি নেই

যে তরবারির সাহায্যে ইসলাম প্রসার লাভ করেছে বলে প্রচারণা চালানো হয়। সেই তরবারি যদি কোনো লোক পেয়েও থাকতো তবুও তা সে ব্যবহার করতো না। কেননা কুরআন মাজীদ বলছে–

لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ -

অর্থ : দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তী নেই; নিঃসন্দেহে সত্য সঠিক পথ সুস্পষ্ট হয়ে গেছে ভুল পথ থেকে। (সূরা বাকারা : ২৫৬)

১১. জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির তরবারি

ইসলাম যে তরবারি দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করেছে তা ছিল জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির তরবারি। কুরআন মাজীদের সূরা আন নাহলে বলা হয়েছে–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ - وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ -

অর্থ : আপনি মানুষকে আপনার রবের পথের দিকে আহ্বান করুন প্রজ্ঞা, বুদ্ধিবৃত্তি এবং উত্তম উপদেশ দানের মাধ্যমে। আর তাদের সাথে বির্তক করুন উত্তম পন্থায়। (সূরা নাহ্ল : ১২৫)

১২. ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত বিশ্বে ধর্মসমূহের প্রবৃদ্ধির হার

'রিডার্স ডাইজেস্টের অ্যালম্যানাক' তথা বার্ষিক সংখ্যার একটি প্রবন্ধে বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মসমূহের অর্ধ শতাব্দীর [১৯৩৪-৮৪] একটি পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে। এ প্রবন্ধটি 'প্লেইন ট্রুথ' নামক ম্যাগাজিনেও এসেছে। উল্লিখিত প্রবন্ধে প্রবৃদ্ধির তালিকার শীর্ষে রয়েছে ইসলাম। ইসলামের প্রবৃদ্ধির হার তাতে ২৩৫% [শতকরা দু'শত পঁয়ত্রিশ] উল্লিখিত হয়েছে। অথচ খ্রিস্টধর্মের প্রবৃদ্ধির হার তাতে শতকরা ৪৭% ভাগ বলে উল্লিখিত হয়েছে। কেউ প্রশ্ন করতে পারে এ শতাব্দীতে কোন যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল, যা কোটি কোটি মানুষকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে।

১৩. আমেরিকা ও ইউরোপে ইসলাম-ই সবচেয়ে দ্রুত বিকাশমান ধর্ম

আজকাল সবচেয়ে দ্রুত বিকাশমান ধর্ম আমেরিকাতে যেমন ইসলাম তেমনি ইউরোপেও সবচেয়ে দ্রুত বিকাশমান ধর্ম ইসলাম। পাশ্চাত্যের এ বিশাল সংখ্যক মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করছে কোন্ তরবারি?

১৪. ড. জোসেফ অ্যাডাম পিয়ার্সন

ড. জোসেফ অ্যাডাম পিয়ার্সন যথার্থই বলেছেন, "যেসব লোক আশঙ্কা করছে যে, আণবিক বোমা কোনো একদিন আরবদের হাতে এসে পড়বে, তারা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, ইসলামি বোমা ইতোমধ্যে বর্ষিত হয়ে গেছে, এটা সেদিনই বর্ষিত হয়েছে যেদিন মুহাম্মদ ﷺ আরবের বুকে জন্মলাভ করেছে।"

৫. মুসলমানরা মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী

প্রশ্ন ৫। অধিকাংশ মুসলমান মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী কেন ?

উত্তর : যখনই ধর্ম বিশ্বাস সংক্রান্ত কোনো আন্তর্জাতিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় তখন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুসলমানদের প্রতি এ প্রশ্নটি ছুঁড়ে দেয়া হয়। প্রচার মাধ্যমগুলোতে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও বিরামহীনভাবে বিভিন্ন ভুল ও মিথ্যা তথ্য সহকারে মুসলমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে এ প্রচারণা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আসলে এ ধরনের ভুল তথ্য এবং মিথ্যা প্রচারণা দ্বারা মুসলমানদেরকে বর্বর ও সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং অন্য ধর্মানুসারীদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছে। আমেরিকার ওকলাহোমায় বোমা বিস্ফোরণের পরে আমেরিকার প্রচার মাধ্যমগুলো এ ধরনের মুসলিম বিরোধী প্রচারণা চালিয়েছে। অত্যন্ত দ্রুত তাদের প্রচার মাধ্যমগুলো ঘোষণা করে দিয়েছে যে, এ আক্রমণের নেপথ্যে মধ্যপ্রাচ্যের ষড়যন্ত্র রয়েছে। অবশেষে আমেরিকার আর্মড ফোর্সের একজন সৈনিক অপরাধী হিসেবে প্রমাণিত হয়।

চলুন, 'মৌলবাদ' (Fundamentalism) এবং 'সন্ত্রাসবাদ' (Terrorism) -এর অভিযোগ দুটো পর্যালোচনা করা যাক।

১. 'মৌলবাদী' শব্দের সংজ্ঞা

'মৌলবাদী' এমন এক ব্যক্তি, যে অনুসরণ ও আনুগত্য করে তার চিন্তা ও বিশ্বাসের মূলনীতির। একজন লোক যদি ডাক্তার হতে চায়, তাকে অবশ্যই ওষুধ সম্পর্কে জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং ওষুধের মৌলিক কার্যকারিতা সম্পর্কে জেনে চিকিৎসার ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করতে হবে। অন্য কথায় ওষুধের ক্ষেত্রে তাকে 'মৌলবাদী' হতে হবে। একইভাবে যে গণিতশাস্ত্রে পারদর্শী হতে চায় তাকে অবশ্যই গণিত শাস্ত্রের মূলনীতি সম্পর্কে জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং সে অনুযায়ী অনুশীলন করতে হবে। বলা যায় যে, তাকে অবশ্যই গণিতশাস্ত্রের ক্ষেত্রে 'মৌলবাদী' হতে হবে। যে ব্যক্তি ভালো বিজ্ঞানী হতে চায় তাকে অবশ্যই বিজ্ঞানের মূলনীতিগুলো জানতে, বুঝতে ও সে অনুযায়ী অনুশীলন করতে হবে এবং তাকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 'মৌলবাদী' হতে হবে।

২. সকল মৌলবাদী এক রকম নয়

সকল মৌলবাদীর ছবি একই রং তুলিতে আঁকা যাবে না। সকল মৌলবাদীকে তাই একই শ্রেণীতে ফেলে সব মৌলবাদী ভালো বা সব মৌলবাদী মন্দ একথা বলা যাবে না। মৌলবাদীর শ্রেণীবিন্যাস নির্ভর করে কোনো ব্যক্তি যে বিষয়ের ভিত্তিতে 'মৌলবাদী' বলে চিহ্নিত হয়েছে সে বিষয় ও তার কার্যাবলির ওপর। একজন মৌলবাদী ডাকাত বা একজন মৌলবাদী চোর সমাজের জন্য ক্ষতিকর। তাই এ জাতীয় মৌলবাদী সমাজে অনাকাঙ্খিত। অপরদিকে একজন মৌলবাদী ডাক্তার সমাজের জন্য উপকারী। তাই মৌলবাদী ডাক্তার সমাজে কাঙ্খিত এবং সম্মানিত।

৩. আমি একজন 'মুসলিম মৌলবাদী' হতে পেরে গর্বিত।

আল্লাহর রহমতে আমি ইসলামের মূলনীতিসমূহ জানি, বুঝি এবং অনুসরণ করতে সাধ্যমত চেষ্টা করি। একজন সত্যিকার মুসলিম মৌলবাদী হতে লজ্জাবোধ করে না। আমি একজন মৌলবাদী মুসলিম হতে পেরে গর্বিত। কেননা আমি জানি ইসলামের মূলনীতিগুলো বিশ্ব মানবতার জন্য কল্যাণকর। মানবজাতির স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর ইসলামের এমন একটিও মূলনীতি নেই। অনেক মানুষ ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করে এবং ইসলামের কিছু কিছু শিক্ষাকে তারা অলৌকিক ও অবিচারমূলক বলে মনে করে। এটা ইসলাম সম্পর্কে তাদের অপ্রতুল ও ভুল জ্ঞানের কারণে হয়েছে। একজন মানুষ যদি মুক্তমনে সূক্ষ্মভাবে ইসলামের শিক্ষাগুলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে, তার প্রকৃত সত্য স্বীকার করতেই হবে যে, ইসলাম ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয় পর্যায়েই মানব কল্যাণের অনন্য বিধান।

৪. 'মৌলবাদ' (Fundamentalism) শব্দের আভিধানিক অর্থ

ওয়েবস্টার ডিকশনারি অনুযায়ী 'মৌলবাদ' হলো বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আমেরিকার প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদী খ্রিস্টানদের একটি আন্দোলনের নাম। এটা ছিল আধুনিকতাবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া, বাইবেলের অকাট্যতার ওপর একটি জোর প্রচেষ্টা। তা শুধু বিশ্বাস ও শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে নয় বরং সাহিত্য ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও। এ আন্দোলন বাইবেলকে আক্ষরিক অর্থে 'গড'-এর বাণী বলে বিশ্বাস করার ওপর জোর দেয়। যা হোক 'মৌলবাদী' এমন একটি শব্দ যা সূচনায় খ্রিস্টানদের একটি দলের বিশ্বাস ও কর্মের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। যারা বিশ্বাস করতো যে, বাইবেল আক্ষরিক অর্থেই 'গড'-এর বাণী যাতে কোনো ভুল নেই। অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনুসারে 'ফান্ডামেন্টালিজম' অর্থ যে কোনো ধর্ম বিশেষ করে ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান ও নীতিমালা কঠোরভাবে মেনে চলা।

অধুনা কোনো লোক ফান্ডামেন্টালিজম তথা 'মৌলবাদ' শব্দটি উচ্চারণ করলে তার মনে আসে একজন মুসলিমের কথা যে সন্ত্রাসী।

৫. প্রত্যেক মুসলমানের সন্ত্রাসী হওয়া উচিত

প্রত্যেক মুসলমান এক একজন সন্ত্রাসী হওয়া উচিত। একজন সন্ত্রাসী সেই ব্যক্তি যে সন্ত্রাসের মূল কারণ। ডাকাত যখনই পুলিশকে দেখে, সে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। সুতরাং পুলিশ ডাকাতের জন্য সন্ত্রাসী। তেমনিভাবে একজন মুসলমানকে সমাজ বিরোধী শক্তি যেমন চোর, ডাকাত ও ধর্ষকের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হওয়া কর্তব্য। যখনই উল্লিখিত সমাজ বিরোধী শক্তি একজন মুসলমানকে দেখবে সে আতঙ্কিত হয়ে পড়বে। এটা সত্য যে, 'সন্ত্রাসী' শব্দটি এমন লোকের জন্য ব্যবহৃত হয়, যে সাধারণ জনগণের জন্য আতঙ্কের কারণ হয়। কিন্তু একজন সত্যিকার মুসলিম শুধু কিছু লোকের জন্য যেমন : সমাজ বিরোধী শক্তি যারা জনগণের দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয় তাদের জন্য সন্ত্রাসী। সমাজের সাধারণ মানুষের জন্য একজন মুসলিম সন্ত্রাসী নয়। সত্যিকার অর্থে সর্বসাধারণ তথা নিরীহ জনসাধারণের জন্য একজন মুসলিম হবে শান্তি ও কল্যাণের প্রতীক।

৬. এইক ব্যক্তিকে বিভিন্ন খেতাবে ভূষিত একই ব্যক্তিকে একই কাজের জন্য বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে সন্ত্রাসী ও দেশ প্রেমিক। ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে অনেক স্বাধীনতা যোদ্ধা যারা মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের সমর্থন দেয় নি তাদের প্রতি ব্রিটিশ সরকার 'সন্ত্রাসী' লেবেল লাগিয়ে দিয়েছিল। একই ব্যক্তিদেরকে একই কাজের জন্য ভারতবাসী 'দেশপ্রেমিক' আখ্যা দিয়ে তাদেরকে অভিনন্দিত করে। এভাবে একই ব্যক্তিদেরকে একই কার্যাবলির জন্য ভিন্ন ভিন্ন লেবেল এঁটে দেয়া হয়। একপক্ষ তাদেরকে 'সন্ত্রাসী'

আখ্যা দেয় অথচ অপরপক্ষ তাদেরকে 'দেশপ্রেমিক' নামে আখ্যায়িত করে। যারা বিশ্বাস করতো যে, ব্রিটেনের ভারত শাসনের অধিকার আছে, তারা বিপ্লবীদেরকে 'সন্ত্রাসী' আখ্যা দেয়। অপরদিকে যারা মনে করতো যে, বৃটেনের ভারত শাসনের কোনো অধিকার নেই, তারা বিপ্লবীদেরকে আখ্যা দেয় 'দেশপ্রেমিক' ও 'স্বাধীনতা যোদ্ধা'।

কাজেই কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে ভালো-মন্দ মন্তব্য করার আগে তার কথা আগে শুনে নিতে হবে। পক্ষে-বিপক্ষে সব যুক্তিই শুনে নিতে হবে। অবস্থা বিশ্লেষণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও তার কার্যাবলির কারণ সামনে রেখে সে অনুসারে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে।

৭. ইসলাম অর্থ শান্তি

'ইসলাম' শব্দটি 'সালাম' শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ 'শান্তি'। ইসলাম শান্তির ধর্ম যার মৌলনীতিসমূহ তার অনুসারীদের সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার শিক্ষা দেয় এবং তা বজায় রাখার জন্য কাজ করে যেতে বলে। অতএব প্রত্যেকটি মুসলমানকে মৌলবাদী হতে হবে অর্থাৎ শান্তির ধর্ম ইসলামের মৌলনীতিসমূহ তাকে যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। সমাজ বিরোধী শক্তিগুলোর জন্যই সে হবে একজন 'সন্ত্রাসী' তথা আতঙ্ক সৃষ্টিকারী, তাহলেই সমাজে শান্তি ও ন্যায়-ইনসাফ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাবে এবং এ বৃদ্ধির ধারাও বজায় থাকবে।

আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ

প্রশ্ন ৬। প্রাণী হত্যা করা একটি নিষ্ঠুর কাজ। মুসলমানরা আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে কেন?

উত্তর : 'নিরামিষবাদ' (vegetarianism) আজকাল বিশ্বব্যাপী একটি আন্দোলন। অনেকে এটাকে পশু অধিকারের সাথে যুক্ত করে। অধিকন্তু বিপুল সংখ্যক মানুষ মাংস ভক্ষণ ও অন্যান্য আমিষ জাতীয় উৎপাদন সামগ্রী ভোগ ও ব্যবহার করাকে পশু অধিকার লঙ্ঘন বলে সাব্যস্ত করে।

ইসলাম সৃষ্টজীবের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের নির্দেশ ঘোষণা করে। সাথে সাথে ইসলাম বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ এ বিশ্ব এবং এ বিশ্বের উদ্ভিদ জগৎ ও প্রাণীকুল মানবজাতির জন্য কল্যাণের সৃষ্টি করেছেন। এখন এসব নিয়ামত ও আমানত তথা আল্লাহর দেয়া সামগ্রী ন্যায় ও ইনসাফের সাথে ভোগ-ব্যবহার করা মানুষের দায়িত্ব।

চলুন এ বিতর্কের আরো কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করা যাক।

১. একজন মুসলমান বিশুদ্ধ নিরামিষ ভোজী হতে পারে

একজন মুসলিম খাঁটি মুসলমান হয়েও খাঁটি নিরামিষ ভোজী হতে পারেন। আমিষ জাতীয় খাদ্যগ্রহণ একজন মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক নয়।

২. কুরআন মাজীদ আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দান করে

আল-কুরআন একজন মুসলমানকে আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দেয়। নিচের আয়াত তার প্রমাণ–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلاَّ مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ ـ

অর্থ : যারা ঈমান এনেছো, তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে চতুষ্পদ জন্তু সেগুলো ছাড়া যা...। (সূরা মায়েদা : ১)

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ـ

অর্থ : আর তিনি সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তু, এতে রয়েছে তোমাদের জন্য শীতের সম্বল, আরো রয়েছে অনেক উপকার এবং তা থেকে তোমরা কিছু সংখ্যক খেয়েও থাকো।

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ـ

অর্থ : নিশ্চয় তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে শিক্ষণীয় রয়েছে। আমি তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরস্থিত বস্তু থেকে। আর তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে রয়েছে অনেক উপকারিতা এবং তোমরা তাদের ভক্ষণ করে থাকো। (সূরা মু'মিনুন : ২১)

৩. একমাত্র পুষ্টিকর ও আমিষে পরিপূর্ণ খাদ্যমান পাওয়া যায় মাংস থেকে

আমিষ জাতীয় খাদ্যই প্রোটিনের উত্তম উৎস। এতে জৈবিকভাবেই প্রচুর প্রোটিন রয়েছে। যেমন ৮টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অ্যামিনো এসিড যা শরীর দ্বারা পূর্ণ হয় না, তা সুষম খাদ্যের মাধ্যমে সরবরাহ করতে হয়। মাংসের মধ্যে রয়েছে আয়রন, ভিটামিন বি-১ এবং নিয়াসিন।

৪. মানুষের রয়েছে এক সেট সর্বভুক দাঁত

আপনি যদি ভালোভাবে লক্ষ করেন তাহলে দেখে আশ্চর্য হবেন যে, তৃণভোজী প্রাণী, যেমন গরু, ছাগল ও ভেড়া ইত্যাদি প্রাণীর দাঁতের বিন্যাস একই রকম, অর্থাৎ এসব পশুর দাঁত ভোঁতা ও সমতল যা তৃণ জাতীয় খাদ্য গ্রহণের উপযোগী, অপরদিকে

আপনি যদি মাংসাশী প্রাণীদের যেমন সিংহ, বাঘ ও নেকড়ে ইত্যাদি প্রাণীর দাঁত লক্ষ করেন তবে দেখতে পাবেন যে, এসব পশুর দাঁত সুঁচালো ও ধারালো যা মাংস জাতীয় খাদ্য খাওয়ার উপযোগী। এমনিভাবে আপনি যদি মানুষের দাঁতগুলো লক্ষ করেন তাহলে বিস্ময়করভাবে দেখতে পাবেন যে, তাদের দু' ধরনের দাঁত রয়েছে। তাঁদের যেমন রয়েছে ভোতা দাত, তেমনি রয়েছে সুঁচালো দাঁত। অর্থাৎ মানুষের দাঁত মাংস ও তৃণ উভয় জাতীয় খাদ্য গ্রহণের উপযোগী। অতএব মানুষের দাঁত সর্বভুক। যে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ যদি চাইতেন যে, মানবজাতি শুধু তৃণজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করবে, তাহলে তিনি মানুষকে ধারালো ও সুঁচালো দাঁত কেন দিলেন? এটা স্বাভাবিকভাবেই বোধগম্য হয় যে, তিনি জানেন মানুষকে প্রয়োজনেই নিরামিষ ও আমিষ উভয় ধরনের খাদ্য গ্রহণ করতে হবে।

৫. আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকার খাদ্য মানুষ হজম করতে পারে

তৃণভোজী প্রাণীগুলো শুধু তৃণজাতীয় খাদ্য হজম করতে পারে। অপরদিকে মাংসাশী প্রাণীগুলো কেবল মাংস হজম করতে পারে। কিন্তু মানুষ নিরামিষ ও আমিষ উভয় জাতীয় খাদ্য হজম করতে পারে। মানুষের খাদ্য পরিপক তন্ত্র উভয় ধরনের খাদ্য হজম করতে সক্ষম। সর্বশক্তিমান আল্লাহ যদি তাই চাইতেন, আমরা শুধু নিরামিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করি তাহলে তিনি আমাদেরকে আমিষ নিরামিষ উভয় ধরনের খাদ্য হজম করার শক্তি কেন দিলেন?

৬. হিন্দুধর্মের পবিত্র গ্রন্থসমূহ আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দেয়

ক. অনেক হিন্দু আছেন যারা কার্যকরভাবে নিরামিষ ভোজী। আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণকে তারা তাদের ধর্মবিরোধী মনে করে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো ধর্মগ্রন্থগুলো আমিষ তথা মাংস ভক্ষণের অনুমতি দেয়। ধর্মগ্রন্থসমূহে উল্লিখিত আছে যে, হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীরা আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করতেন।

খ. হিন্দুধর্মের আইনের গ্রন্থ মনু শ্রুতি'র ৫ম অধ্যায়, ৩০ নং শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে—

"খাবার গ্রহণকারী সেসব পশুর মাংসই খায়, যা খাওয়া যায়, তবে এতে সে কোনো মন্দ কিছু করে না। এমনকি সে যদি এটা দিনের পর দিনও করে যায়; কেননা ঈশ্বর-ই কতককে ভক্ষিত হওয়ার জন্য এবং কতককে ভক্ষক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।

গ. আবার মনুশ্রুতির একই অধ্যায়ের পরবর্তী ৩১ নং শ্লোকে বলা হয়েছে—

'উৎসর্গের শুদ্ধতার জন্য মাংস ভক্ষণ যথার্থ, এটা ঈশ্বরের বিধান হিসেবে প্রচলিত।'

ঘ. অতঃপর মনুশ্রুতির ৫ম অধ্যায়ের ৩৯ এবং ৪০ নং শ্লোকে বলা হয়েছে—

'ঈশ্বর নিজেই উৎসর্গের উপযোগী পশু সৃষ্টি করেছেন— সুতরাং উৎসর্গের জন্য প্রাণী বধ হত্যা নয়।'

মহাভারতের অনুশাসন পর্বের ৮৮ নং অধ্যায়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং পিতামহ ভীস্মদেবের মধ্যে শ্রাদ্ধের সময় কি খাদ্য পরিবেশন করলে পিতৃপুরুষগণকে সন্তুষ্ট করা যাবে— এ সম্পর্কে যে কথোপকথন হয়েছে তা নিম্নরূপ :

"যুধিষ্ঠির বলল, 'হে মহাশক্তিমান প্রভু, আমাকে বলুন, সেসব জিনিস কী কী— যেগুলো পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধে উৎসর্গ করলে তারা শান্তি পাবে? কী কী জিনিস উৎসর্গ করলে তা স্থায়িত্ব লাভ করবে? আর কী কী জিনিস উৎসর্গ করলে তা চিরস্থায়ী হবে?'

ভীস্মদেব বললেন, "যুধিষ্ঠির! তুমি আমার কাছে শোনো— যেসব দ্রব্যসামগ্রী শ্রাদ্ধের জন্য উপযোগী ও যথাযথ এবং যেসব ফল-ফলাদি তার সঙ্গে দিতে হবে, তা হলো সীমের বিচি, চাউল, বার্লি, মাসা, পানীয় এবং বৃক্ষমূল ও ফলাহার যদি শ্রাদ্ধের সাথে যায় তাহলে হে রাজা, পিতৃপুরুষ এক মাসের জন্য সন্তুষ্ট থাকবে। যদি শ্রাদ্ধে মৎস্য উৎসর্গ করা হয় তাহলে তারা দু' মাসের জন্য সন্তুষ্ট থাকবে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে ভেড়ার মাংস পরিবেশন করলে তারা (পিতৃপুরুষগণ) তিন মাসের জন্য সন্তুষ্ট থাকবে। খরগোশের মাংস দ্বারা চার মাস, ছাগলের মাংস দ্বারা পাঁচ মাস, শূকর মাংস দ্বারা ছয় মাস, পাখির মাংস দ্বারা সাত মাস, 'প্রিসাতা' হরিণের মাংস দ্বারা তারা আট মাস পরিতৃপ্ত থাকবে। রুরু হরিণ দ্বারা নয় মাস, গয়ালের মাংস দিলে দশ মাস এবং মহিষের মাংস দ্বারা আপ্যায়ন করলে তাদের সন্তুষ্টি স্থায়ী হয় এগারো মাস। গরুর মাংস দ্বারা তাদের সন্তুষ্টি স্থায়ী হয় পুরো একটি বছর। ঘি মিশ্রিত পায়েশ পিতৃপুরুষদের কাছে গরুর মাংসের মতোই গ্রহণীয়। ভদ্রিনাশার (এক প্রকার বড় ষাড়) মাংস দ্বারা সন্তুষ্টি স্থায়ী হয় বার বছর। শুক্ল পক্ষের কোনো দিবসে তাদের মৃত্যু হলে এবং সেই দিবসে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে গণ্ডারের মাংস দ্বারা আপ্যায়ন করতে পারলে তাদের সন্তুষ্টি অক্ষয় হয়ে যায়। 'কালাসকা' নামক সবজি, কাঞ্চন ফুলের পাপড়ি ও লাল ছাগলের মাংস দিতে পারলেও তাদের সন্তুষ্টি চিরস্থায়ী হয়ে যায়।

অতএব আপনি যদি চান যে, আপনার পিতৃপুরুষদেরকে চিরস্থায়ীভাবে সন্তুষ্টি করতে তাহলে আপনাকে লাল ছাগলের মাংস দিয়ে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আপ্যায়ন করতে হবে।

৭. 'হিন্দুবাদ' অন্যান্য ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত

যদিও হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থগুলো তাদের অনুসারীদেরকে আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণের অনুমতি প্রদান করে তবুও অনেক হিন্দুই নিরামিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণকে তার সাথে সংযুক্ত করে নিয়েছে। কেননা তারা অন্য ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, যেমন : জৈনধর্ম।

৮. উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে

কিছু নির্দিষ্ট ধর্ম তাদের খাদ্যনীতিতে নিরামিষবাদকে সংযোজন করে নিয়েছে। কারণ তারা জীবহত্যার একেবারেই বিরোধী। যদি কোনো ব্যক্তি কোনো প্রকার প্রাণী হত্যা ছাড়া জীবন-যাপন করতে পারেন, তাহলে আমিই এ ধরনের জীবন পদ্ধতি গ্রহণকারী প্রথম ব্যক্তি হবো। আগেকার লোকেরা মনে করতো যে, উদ্ভিদের প্রাণ নেই, তারা প্রাণহীন পদার্থ। কিন্তু আজকাল এটা সার্বজনীন সত্য যে, প্রত্যেকটি উদ্ভিদের প্রাণ আছে। সুতরাং খাঁটি নিরামিষ ভোজী হলেও তাদের জীব হত্যা না করার যুক্তি যথার্থ হয় না।

৯. উদ্ভিদ ব্যথা বেদনা অনুভব করতে পারে

নিরামিষবাদীরা পুনর্যুক্তি প্রদর্শন করতে পারে যে, উদ্ভিদ ব্যথা অনুভব করতে পারে না। সুতরাং একটি প্রাণী হত্যার চেয়ে উদ্ভিদ হত্যা লঘু অপরাধ। অধুনা বিজ্ঞান আমাদেরকে বলে যে, উদ্ভিদও ব্যথা অনুভব করতে পারে। কিন্তু উদ্ভিদের সেই কান্না মানুষ শুনতে সক্ষম নয়। এটা এজন্য যে, মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয় ২০ হার্টজ থেকে ২০,০০০ হার্টজ-এর বাইরের শব্দ শুনতে সক্ষম। ২০ হার্টজ -এর নিচের এবং ২০,০০০ হার্টজ এর উপরের কোনো শব্দ মানুষ শুনতে সক্ষম নয়। একটি কুকুর ৪০,০০০ হার্টজ পর্যন্ত শব্দ শুনতে পায়। তাই কুকুরের জন্য নীরব হুইসেল তৈরি করা হয়েছে যার ফ্রিকোয়েন্সি ২০,০০০ থেকে ৪০,০০০-এর মধ্যে। এসব হুইসেলের শব্দ একমাত্র কুকুরই শুনতে সক্ষম। মানুষ এর শব্দ শুনতে সক্ষম না। এ হুইসেলের শব্দ শুনে কুকুর তার প্রভুকে চিনে নিতে পারে এবং প্রভুর কাছে ছুটে আসে। আমেরিকার একজন কৃষি খামারের মালিক অনেক গবেষণা করে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন যা দিয়ে উদ্ভিদের কান্না মানুষের শ্রুতিযোগ্য করে তোলা যায়। সে বুঝে নিতে পারতো উদ্ভিদ কখন পানির জন্য কাঁদে। সর্বশেষ গবেষণার ফল হলো, উদ্ভিদ সুখ-দুঃখ অনুভব করতে পারে এবং পারে চিৎকার করে কাঁদতে।

১০. দুই ইন্দ্রিয়বিহীন প্রাণী হত্যা করা কোনো লঘু অপরাধ নয়

একদা নিরামিষ ভোজীরা যুক্তি দিতেন যে, উদ্ভিদের মাত্র দুটো ইন্দ্রিয় আছে, অথচ প্রাণীদের রয়েছে পাঁচটি ইন্দ্রিয়। সুতরাং উদ্ভিদ হত্যা প্রাণী হত্যার চেয়ে লঘু অপরাধ। ধরা যাক, আপনার এক ভাই জন্ম থেকেই বোবা ও কানা এবং সে অন্য একজন মানুষের চেয়ে দুটো ইন্দ্রিয় কম পেয়েছে। সে যখন বয়োপ্রাপ্ত হলো, তখন এক ব্যক্তি তাকে হত্যা করলো। এখন বলুন, আপনার ভাইয়ের যেহেতু দুটো ইন্দ্রিয় কম ছিল। আপনি কি বিচারককে অপরাধীর সাজা কমিয়ে দেয়ার অনুরোধ করবেন? কেননা আপনার ভাইয়ের দুটো ইন্দ্রিয় কম ছিল। প্রকৃতপক্ষে আপনি তখন বিচারককে বলবেন যে, হত্যাকারী একজন মাসুম বা নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। তাই বিচারকের কর্তব্য অপরাধীকে কঠোরতর শাস্তি দেয়া।

আল-কুরআন ঘোষণা করেছে —

يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلاً طَيِّبًا .

অর্থ : হে মানুষ! পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মধ্য থেকে পবিত্র ও উত্তম জিনিসগুলো খাও। (সূরা বাকারা : ১৬৮)

১১. গো-মহিষাদীর সংখ্যাবৃদ্ধি

প্রত্যেকটি মানুষ যদি নিরামিষভোজী হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীতে গো-মহিষাদীর সংখ্যা বেড়ে যাবে। যেহেতু তাদের উৎপাদন অত্যন্ত দ্রুত জ্যামিতিক হারে বেড়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা তাঁর অপার্থিব অসীম জ্ঞানের দ্বারা অবগত কীভাবে তাঁর সৃষ্টিকূলের মধ্যে সঠিকভাবে ভারসাম্য রক্ষা করবেন। সুতরাং তিনি আমাদেরকে গো-মহিষাদীর মাংস খাওয়ার অনুমতি দান করলে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

১২. সবাই আমিষভোজী না হওয়ায় মাংসের মূল্য সঙ্গত আছে

কিছু কিছু মানুষ খাঁটি নিরামিষভোজী হলেও আমি তাতে কিছু মনে করি না। তবে আমিষভোজীদের প্রতি তাদের নির্মমভাবে নিন্দা প্রকাশ উচিত নয়। মূলত যদি সব ভারতীয় আমিষভোজী হয়ে যায়, তাহলে বর্তমান আমিষভোজীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা তখন মাংসের মূল্য অনেক বেড়ে যাবে।

৭. পশু যবেহ করার ইসলামি পদ্ধতি দৃশ্যত অত্যন্ত নির্মম

প্রশ্ন ৭। মুসলমানরা পশুকে ধীরে ধীরে যন্ত্রণা দিয়ে অত্যন্ত নির্মমভাবে যবেহ করে কেন?

উত্তর : পশু যবেহ করার ইসলামি পদ্ধতিটি বেশ কিছু সংখ্যক মানুষের সমালোচনার লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছে।

প্রশ্নটির উত্তর দেয়ার আগে আমি পশু যবেহ সম্পর্কে একজন শিখ ও একজন মুসলিমের মধ্যকার আলোচনা উল্লেখ করতে চাই।

একদা একজন শিখ একজন মুসলমানকে প্রশ্ন করে যে, তোমরা পশুকে গলা কেটে যন্ত্রণা দিয়ে নির্মমভাবে কেন যবেহ কর? আমরা তো এক ঝটকায় পশুর গলা কেটে ফেলি। মুসলমান লোকটি উত্তর দিলেন, "আমরা অত্যন্ত সাহসী, তাই সামনে থেকে আক্রমণ চালাই। আমরা 'মরদ কা কাচ্চা'। আর তোমরা কাপুরুষ তাই পেছন থেকে আক্রমণ কর।" এটা নিছক একটা হাস্যরসাত্মক গল্প বটে। তবে ইসলামি যবেহ পদ্ধতি যে শুধু মানবিক তা নয় বরং এ পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক তা নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করলে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

১. পশু যবেহের ইসলামি পদ্ধতি

'যাকাহ' মূল ধাতু থেকে 'যাক্কাইতুম' শব্দটি গৃহীত হয়েছে যার অর্থ পবিত্র করে থাক। 'তাযকীয়াহ' শব্দটি হলো এর অসমাপিকা ক্রিয়া যার অর্থ পবিত্রকরণ।

পশু যবেহের ইসলামি পদ্ধতি অনুসরণ করতে এ শর্তগুলো পূরণ করতে হবে—

ক. পশু যবেহের হাতিয়ার (ছুরি) অত্যন্ত ধারালো হতে হবে : পশুকে অত্যন্ত ধারালো ছুরি দিয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে যবেহ করতে হবে, যাতে পশুর যন্ত্রণা যথা সম্ভব কমিয়ে আনা যায়।

খ. গলনালী, শ্বাসনালী ও ঘাড়ের রক্তবাহী নালী কেটে ফেলতে হবে : 'যাবীহ' আরবি শব্দ, যার অর্থ যবেহকৃত পশু। পশুর গলনালী, শ্বাসনালী ও ঘাড়ের দু' পাশের রক্তবাহী নালী কেটে পশুকে যবেহ করতে হবে। পেছন দিকে মেরুদণ্ডের শিরা কাটা যাবে না।

গ. রক্ত বের করে দিতে হবে : মাথা আলাদা করার আগে রক্ত সম্পূর্ণরূপে বের করতে দিতে হবে। এটা এজন্য যে রক্তই হলো যাবতীয় জীবাণু, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদির আবাস। এজন্য ঘাড়ের শিরা কোনো ক্রমেই কাটা যাবে না। কারণ হৃদযন্ত্রের দিক থেকে যেসব শিরা-উপশিরা রয়েছে সেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেমে যেতে পারে। ফলে মাঝ পথে রক্ত আটকে পড়তে পারে।

২. রোগ-জীবাণু ও ব্যাকটেরিয়ার সহজ পরিবহন মাধ্যম হলো রক্ত

রক্ত হলো রোগজীবাণু, ব্যাকটেরিয়া ও জৈব বিষ ইত্যাদির সহজ পরিবহন মাধ্যম। সুতরাং ইসলামি যবেহ পদ্ধতি সবচেয়ে স্বাস্থ্যসম্মত। কেননা রক্তের মধ্যে রোগ-জীবাণু, ব্যাকটেরিয়া ও জৈব বিষ বাসা বেঁধে থাকে। রক্ত বের করে দেয়ার ফলে গোশ্‌ত বা মাংস উল্লিখিত ক্ষতিকর পদার্থ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

৩. গোশত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ভালো থাকে

ইসলামি যবেহের মাধ্যমে গোশ্‌ত দীর্ঘসময় পর্যন্ত সতেজ থাকে। কারণ এ পদ্ধতিতে যবেহে করার ফলে অন্যান্য যবেহ পদ্ধতির চেয়ে গোশতের সাথে রক্তের পরিমাণ সবচেয়ে কম থাকে।

৪. পশু ব্যথা অনুভব করে না

অত্যন্ত দ্রুততার সাথে গলনালীগুলো কেটে দেয়ার ফলে মস্তিষ্কের স্বায়ুতন্ত্রের সাথে রক্তবাহী শিরার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে ব্যথার অনুভূতি আর থাকে না। কারণ মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলোতে রক্ত প্রবাহ-ই ব্যথার অনুভূতি সৃষ্টি করে। মৃত্যুর সময় পশু যে পাগুলো ছুঁড়ে লাফালাফি করে এবং ছটফট করে তা ব্যথার জন্য নয়; বরং তা পেশিগুলোর সংকোচন ও প্রসারণের কারণে গোশতের মধ্যে রক্তের ঘাটতি সৃষ্টি হওয়ার কারণে এবং দ্রুতগতিতে রক্ত পশুদেহের বাইরে চলে যাওয়ার কারণে।

৮. আমিষ জাতীয় খাদ্য মুসলমানদের অত্যন্ত উগ্র করে তোলে

প্রশ্ন ৮ : বিজ্ঞান আমাদেরকে বলে, যে যা খায় তার আচরণে সে খাদ্যের প্রভাব পড়ে। অতএব, ইসলাম মুসলমানদেরকে আমিষ জাতীয় খাদ্যের অনুমতি কেন দিয়েছে, যেখানে পশুর গোশত মানুষকে উগ্র ও হিংস্র করে তোলে?

উত্তর :

১. ইসলাম কেবল তৃণভোজী পশুর গোশ্‌ত-ই খাওয়ার অনুমতি দেয়

এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ একমত যে, একজন ব্যক্তি যা খায়, তার আচরণে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। এটাই হলো কারণ যে, ইসলাম মাংসাশী পশুর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করেছে। যেমন : সিংহ, বাঘ, নেকড়ে ইত্যাদি যেগুলো অত্যন্ত উগ্র ও হিংস্র। সম্ভবত উল্লিখিত পশুর মাংসই মানুষকে উগ্র ও হিংস্র করে তুলতে পারে। ইসলাম মুসলমানদেরকে কেবল তৃণভোজী পশুর মাংস খাওয়ার অনুমতি দেয়। যেমন : গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি যেগুলো অত্যন্ত শান্ত ও পোষমানা। আমরা কেবল শান্ত, নিরীহ ও পোষমানা পশুর গোশতই খেয়ে থাকি। কারণ আমরা শান্তিপ্রিয় ও অহিংস্র।

২. আল-কুরআন বলে, হযরত রাসুল ﷺ যাবতীয় মন্দ থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন

আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ـ

অর্থ : তিনি তাদেরকে ভালো কাজের আদেশ দেন এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করেন। যিনি হালাল করেন তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু এবং যিনি হারাম করেন তার জন্য যাবতীয় অপবিত্র বস্তু। (সূরা আ'রাফ : ১৫৭)

পবিত্র কালামে আরো ইশরাদ হয়েছে–

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ـ

অর্থ : আর রাসূল তোমাদের যা (নির্দেশ) দেন তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো। (সূরা হাশর :৭)

আল্লাহ একজন মুসলমানকে কোন্ কোন্ পশুর গোশত খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন আর কোন্ কোন্ পশুর গোশত খাওয়ার অনুমতি দেন নি এ ব্যাপারে রাসূলের বর্ণিত এ বাণীই যথেষ্ট।

৩. রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীসে মাংসাশী পশুর মাংস খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম-এর 'শিকার ও যবেহ' পর্বে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ ব্যাপারে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সহীহ্ মুসলিম-এর উল্লিখিত পর্বে ৪৭-৫২ নং হাদীস, সুনানে ইবনে মাজাহ'র ১৩শ অধ্যায়ের ৩২৩২ থেকে ৩২৩৪ নং হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিম্নোক্ত পশুগুলোর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। যথা :

ক. তীক্ষ্ণ ও ধারালো দাঁত বিশিষ্ট হিংস্র পশু অর্থাৎ মাংসাশী হিংস্র পশু। এসব পশু সাধারণত বিড়াল প্রজাতির। যেমন : সিংহ, বাঘ, বিড়াল, কুকুর, নেকড়ে, হায়েনা ইত্যাদি।

খ. তীক্ষ্ণ দাঁত বিশিষ্ট ইঁদুর জাতীয় প্রাণী। যেমন : ইঁদুর, নেংটি ইঁদুর, ধারালো নখ বিশিষ্ট খরগোশ ইত্যাদি।

গ. সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী। যেমন : সাপ ও কুমীর ইত্যাদি।

ঘ. ধারালো ঠোঁট ও নখ বিশিষ্ট পাখি। যেমন : কাক, চিল, শকুন ও পেঁচা ইত্যাদি।

৯. মুসলমানরা কা'বার পূজো করে

প্রশ্ন ৯ : মুসলমানরা মূর্তি পূজার বিরোধী, তবে তারা তাদের সালাত আদায়ের সময় কা'বার পূজা এবং কা'বার সামনে মাথা অবনত করে কেন?

উত্তর : কা'বা হলো কিবলা অর্থাৎ সালাত আদায়ের সময় মুসলমানদের যে দিকে ফিরতে হয়, তার দিক নির্দেশক স্থান। লক্ষণীয় বিষয় হলো মুসলমানেরা তাদের সালাত আদায়ের সময় যদিও কা'বার দিকে তাদের মুখ ফেরায় কিন্তু তারা কা'বার পূজা করে না। তারা আল্লাহ ছাড়া কারো দাসত্ব করে না। কারো সামনে মাথা নত করে না।

কুরআন মাজীদের সূরা আল-বাকারায় বলা হয়েছে—

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ -

অর্থ : বারবার আকাশের দিকে আপনার তাকানোকে আমি অবশ্য লক্ষ করেছি; কাজেই এমন কিবলার দিকে আমি আপনাকে ফিরিয়ে দেবো, যা আপনি পছন্দ

করেন। এখন আপনি মাসজিদে হারামের দিকে মুখ ফেরান। আর তোমরা যেখানেই থাকো না কেন সেদিকেই মুখ ফেরাও। (সূরা বাকারা : ১৪৪)

১. ইসলাম ঐক্যকে উৎসাহিত করার নীতিতে বিশ্বাসী

মুসলমানরা যখন তাদের সালাত আদায় করতে চায়। তাহলে তাদের কেউ হয়তো উত্তর দিকে মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করার ইচ্ছে করবে। আবার কেউ হয়তো দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরিয়ে। সকল মুসলমানকে এক আল্লাহর ইবাদতে চূড়ান্তভাবে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য– তারা তাদের এক আল্লাহর ইবাদতে যেখানেই থাকুক না কেন, তাদেরকে একই কা'বার দিকে মুখ ফেরানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেসব মুসলমান কা'বার পশ্চিম পাশে বাস করে তারা পূর্ব দিকে ফিরে এবং যারা কা'বার পূর্ব পাশে বাস করে তারা পশ্চিম দিকে ফিরে সালাত আদায় করবে। এভাবে কা'বার দক্ষিণের লোকেরা উত্তর দিকে এবং কা'বার উত্তরের লোকেরা দক্ষিণ দিকে ফিরে সালাত আদায় করবে। এভাবে তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ঐক্য সৃষ্টি হবে।

২. বিশ্ব মানচিত্রে কা'বার অবস্থান পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে

মুসলমানরাই সর্বপ্রথম পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করে। তাদের অঙ্কিত মানচিত্রে দক্ষিণ দিক নির্দেশিত উপরের দিকে এবং উত্তর দিকে নির্দেশিত ছিল নিচের দিকে। কা'বা ছিল কেন্দ্রস্থল। অতঃপর পশ্চিমা মানচিত্র অঙ্কন করে উপরের দিককে নিচের দিকে এবং নিচের দিককে উপরেরর দিকে রেখে মানচিত্র অঙ্কন করে। অর্থাৎ তারা উত্তর দিককে উপরের দিকে নির্দেশ করে এবং দক্ষিণ দিককে নিচের দিকে নির্দেশ করে। আল-হামদুলিল্লাহ, তা সত্ত্বেও বিশ্ব মানচিত্রে কা'বার অবস্থান পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে রয়েছে।

৩. কা'বাকে কেন্দ্র করে তাওয়াফ করা আল্লাহর একত্ববাদের নির্দেশক

মুসলমানরা যখন কা'বা দর্শনে যায়, তখন তারা তাওয়াফ করে অর্থাৎ কা'বাকে কেন্দ্র করে তার চারদিকে প্রদক্ষিণ করে। এটা বিশ্বাসের প্রতীক এবং আল্লাহর ইবাদাতের প্রতীক। যেহেতু প্রত্যেক বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু মাত্র একটি। কাজেই ইবাদাতের যোগ্য সত্তা একমাত্র এক আল্লাহ এটা তারই নিদর্শন।

৪. হযরত ওমর (রা)-এর হাদীস

'হাজরে আসওয়াদ' তথা কালো পাথর সম্পর্কে ওমর (রা)-এর হাদীস রয়েছে, যাকে হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় 'আসার' তথা প্রথা-ঐতিহ্য বলা হয়। হযরত ওমর (রা) ছিলেন মুহাম্মদ (স)-এর প্রসিদ্ধ সাহাবী বাসাথীদের অন্যতম।

সহীহ্ বুখারী দ্বিতীয় খণ্ড-এর হজ পর্ব, অধ্যায় ৫৬, হাদীস নং ৬৭৫-এ উল্লিখিত আছে যে, ওমর (রা) বলেছেন, "আমি জানি, তুমি একটি পাথরমাত্র কারো কোনো

উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা তোমার নেই। আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাকে স্পর্শ করতে (এবং চুম্বন করতে) না দেখতাম তাহলে আমি কখনো তোমাকে স্পর্শ (এবং চুম্বন) করতাম না।

৫. মানুষ কা'বার উপরে উঠে 'আযান' দিতো

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মানুষ কা'বা ঘরের উপরে উঠে আযান দিতো অর্থাৎ সালাতের জন্য আহ্বান জানাতো। যারা অভিযোগ করে যে, মুসলমানরা কা'বার পূজা করে তাদেরকে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, কোনো মূর্তিপূজক এমন আছে যে, তার পূজ্য মূর্তির উপরে উঠে দাঁড়ায়।

১০. মক্কায় অমুসলিমদের প্রবেশাধিকার নেই

প্রশ্ন ১০। পবিত্র শহর মক্কা ও মদিনাতে অমুসলিমদের প্রবেশাধিকার নেই কেন?

উত্তর : এটা অনস্বীকার্য যে, পবিত্র শহর মক্কা ও মদিনায় অমুসলিমদের আইনগতভাবে প্রবেশাধিকার নেই। নিচের বিষয়গুলো এ নিষেধাজ্ঞার সম্ভাব্য কারণগুলো উদঘাটনে সহায়তা করবে।

১. ক্যান্টনমেন্ট এরিয়া তথা সেনানিবাস অঞ্চলে সকল নাগরিকের প্রবেশাধিকার নেই।

আমি একজন ভারতীয় নাগরিক। তা সত্ত্বেও সুনির্দিষ্ট কিছু এলাকায় আমার প্রবেশাধিকার নেই। যেমন : সেনানিবাস। প্রত্যেক দেশেই এমন কিছু স্থান রয়েছে যেখানে দেশের সাধারণ নাগরিকদের প্রবেশাধিকার নেই। কেবল সেসব নাগরিক যারা দেশের সেনাবাহিনীতে তালিকাভুক্ত অথবা যারা প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট তারাই সেনানিবাস এলাকায় প্রবেশ করতে পারে। অনুরূপভাবে ইসলাম সমগ্র বিশ্ব এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি বিশ্বজনীন ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থা। পবিত্র মক্কা ও মদিনা শহর দুটো হলো– ইসলামের সেনানিবাস এলাকা। এখানে প্রবেশাধিকার তাদেরই থাকা উচিত, যারা ইসলামে বিশ্বাস করে এবং যারা ইসলামকে সুরক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ মুসলমানদের।

একজন সাধারণ নাগরিকের সেনানিবাস এলাকায় প্রবেশাধিকারে কড়াকড়ির বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা অযৌক্তিক। সুতরাং মক্কা ও মদিনায় প্রবেশাধিকার সংরক্ষণের বিরুদ্ধে কোনো অমুসলমানের পক্ষ থেকে আপত্তি উত্থাপন করাও সঙ্গত নয়।

২. মক্কা-মদিনায় প্রবেশের ভিসা

ক. কোন লোক যদি নিজ দেশ থেকে বহির্দেশে যেতে চায় তাহলে তাকে প্রথমে সে দেশের ভিসা তথা সে দেশে প্রবেশের অনুমতি লাভের জন্য আবেদন

জানাতে হয়। ভিসা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশের বেশ কিছু নিজস্ব বিধি-বিধান ও শর্তাবলি থাকে, যা পূরণ না হলে ভিসা দেয়া হয় না।

খ. ভিসার ব্যাপারে যেসব দেশ খুব কড়াকাড়ি করে, তন্মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অন্যতম। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশের নাগরিকের ভিসা ইস্যুর ব্যাপারে এ কড়াকড়িটা অত্যন্ত বেশি। ভিসা ইস্যুর বেশ কিছু পূর্ব শর্ত তাদের রয়েছে, যা পূরণ সাপেক্ষে ভিসা ইস্যু করা হয়।

গ. আমাকে একবার সিঙ্গাপুর ভ্রমণ করতে হয়েছিল, যখন সিঙ্গাপুর পৌঁছি তখন দেখি যে, তাদের ইমিগ্রেশন ফরমে লেখা আছে যে, "মাদক দ্রব্য বহনকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড" আমি যদি সিঙ্গাপুর ভ্রমণ করতে চাই, তাহলে আমাকে তাদের শর্তাবলি তথা আইন-কানুন অবশ্যই মেনে চলতে হবে। আমাকে একথা বলার অধিকার নেই যে, মৃত্যুদণ্ড একটি বর্বর শাস্তি। আমি যদি তাদের চাহিদা ও শর্তাবলি পূরণ করতে পারি, তাহলেই আমি তাদের দেশে প্রবেশের অনুমতি পেতে পারি।

ঘ. যে কোনো মানুষের মক্কা ও মদিনায় প্রবেশের জন্য পূরণীয় প্রথম শর্ত হলো– তাকে মুখে উচ্চারণ করতে হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অর্থাৎ তাকে মৌখিক স্বীকৃতি দিতে হবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। এটা হলো তার ভিসা পাওয়ার তথা প্রবেশের অনুমতি লাভের জন্য প্রথম পূর্বশর্ত।

১১. শূকর-মাংসের নিষিদ্ধতা

প্রশ্ন ১১। শূকরের মাংস ইসলামে নিষিদ্ধ কেন?

উত্তর : এটা সবাই জানে যে, ইসলামে শূকর খাওয়া নিষিদ্ধ। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো এ নিষিদ্ধতার বিভিন্ন কারণ ব্যাখ্যা করবে :

১. কুরআন মাজীদে শূকর খাওয়া নিষিদ্ধ

কুরআন মাজীদে কমপক্ষে চার জায়গায় শূকরের মাংস ভোগ-ভক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেগুলো হলো : (২ : ১৭৩); (৫ : ৩); (৬ : ১৪৫); এবং (১৬ : ১১৫)।

আরো বলা হয়েছে—

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ.

অর্থ : তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃতপ্রাণী, রক্ত, শূকরের মাংস এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা পশু...। (সূরা মায়েদা : ৩)

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতটিই শূকরের মাংস নিষিদ্ধতার কারণ হিসেবে একজন মুসলমানের জন্য যথেষ্ট।

২. বাইবেলেও শূকর -মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ রয়েছে

একজন খ্রিস্টান এ ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতিতে যথাসম্ভব ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারে। বাইবেলের লেভিটিকাস' গ্রন্থে শূকরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে—

And the swine, though he divide the hoof, and be cloven-footed, yet he cheweth not the cud, he is unclean to you.

অর্থ : 'আর শূকর যদিও তার খুর দু খণ্ডে বিভক্ত এবং খুর বিশিষ্ট পায়ের অধিকারী এবং খাদ্য চিবিয়ে খায় জাবর কাটে না, তবুও ওটা তোমার জন্য নোংরা (অপবিত্র)।'

of their flesh sholl ye not eat, and their carcass shall ye not touch, they are unclean to you [leviticas 11 : 7-8]

অর্থ : 'এগুলোর মাংস তুমি খাবে না এবং এগুলোর মৃতদেহ তুমি কখনো স্পর্শ করবে না, এগুলো তোমার জন্য নোংরা অপবিত্র)।' (লেভিটিকাস ১১ : ৭ :৮)

বাইবেলের 'ডিউটারনমী' গ্রন্থেও শূকর মাংস খেতে নিষেধ করা হয়েছে।

And the swine because it divided the hoof, yet cheweth not the cud, it is unclean to you, you shall not eat of their flesh, not touch their deed carcass.

অর্থ : "আর শূকর কেননা তার খুর দ্বিখণ্ডিত, যদিও চিবিয়ে খায়, জাবর কাটে না, এটা তোমার জন্য নোংরা (অপবিত্র) এগুলোর মাংস তুমি খাবে না, আর না এগুলোর মৃতদেহ তুমি স্পর্শ করবে।" (ডিউটারনমি ১৪ : ৮)

বাইবেলের 'ইয়াইয়াহ্' গ্রন্থের ৬৫ অধ্যায়ের ২ থেকে ৫ নং শ্লোকে এ একই নিষিদ্ধতা পুনরুল্লেখ করা হয়েছে।

৩. শূকরের মাংস খাওয়া বেশ কিছু রোগের কারণ

যথার্থ কারণ যুক্তি প্রমাণ ও বিজ্ঞানের মন্তব্য উপস্থাপনের দ্বারা অমুসলিম ও নাস্তিকরা একমত হতে পারে এবং মেনে নিতে পারে যে, একজন ব্যক্তির শূকরের মাংস খাওয়া দ্বারা অন্ততপক্ষে ৭০টি বিভিন্ন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হতে পারে। সে বিভিন্ন রকম ক্রিমি দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। যেমন : গোলাকার ক্রিমি, সূঁচালো ক্রিমি, বক্র ক্রিমি ইত্যাদি। এদের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ক্রিমি হলো টায়েনিয়া সোলিয়াম (Taenia Solium) বা ফিতাক্রিমি, এটা পেটের ভেতরে অনেক লম্বা হয়ে যায়। এর ডিম রক্ত প্রবাহে ঢুকে পড়ে এবং শরীরের প্রায় সব অংশেই ছড়িয়ে পড়ে। এটা যদি মস্তিষ্কে ঢুকে পড়তে পারে, তবে তার স্মৃতিভ্রষ্টের কারণ ঘটে। যদি এটা

হৃদযন্ত্রে ঢুকে, তাহলে হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ হতে পারে। তবে যদি এটা চোখে ঢুকে পড়তে পারে, তবে তা অন্ধত্বের কারণ হতে পারে। আর লিভারে ঢুকে পড়লে লিভার পঁচে যেতে পারে। মোটকথা ফিতাক্রিমির ডিম শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কর্মক্ষমতা ধ্বংস করে দিতে পারে। এরপর আছে ভয়ঙ্কর ত্রিচুরা টিচুরাসীস' (Trichura tichurasis)। শূকর মাংস সম্পর্কে একটি সাধারণ ভুল ধারণা হলো– এটা যদি ভালো করে রান্না করা হয়, তাহলে এসব ওভা বা ডিম নষ্ট হয়ে যায়। আমেরিকায় এ সম্পর্কে একটি গবেষণা কার্যক্রম চালানো হয় এবং তাতে দেখা যায় যে, ২৪ জন উল্লিখিত রোগীর মধ্যে ২২ জনই শূকর মাংস ভালোভাবে রান্না করে খেয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, ফিতাক্রিমির এ ডিম বা 'ওভা' রান্নার সাধারণ তাপমাত্রায় বিনষ্ট হয় না।

৪. শূকর মাংসে চর্বি তৈরির প্রচুর উপাদান রয়েছে

শূকর মাংসে মাংসপেশী তৈরির উপাদান অত্যন্ত কম, কিন্তু চর্বি তৈরির উপাদান অনেক বেশি। এ জাতীয় চর্বিই শিরা-উপশিরায় জমে উচ্চ রক্তচাপ (হাইপারটেনশন) এবং হার্ট অ্যাটাকের কারণ ঘটায়। এটা আশ্চর্যের কিছু না যে, শতকরা ৫০ ভাগ আমেরিকান হাইপার টেনশনে ভোগে।

৫. শূকর পৃথিবীর সবচেয়ে নোংরা প্রাণী

পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে নোংরা প্রাণী হলো শূকর। এ প্রাণীটি নিজেদের বিষ্ঠা, মানুষের মল ও অত্যন্ত নোংরা জায়গায় বাস করে। আমার জানামতে আল্লাহ তাআলা এ প্রাণীটিকে উত্তম মেথর হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। গ্রামাঞ্চলে যেখানে আধুনিক টয়লেট নেই এবং গ্রামীণ লোকেরা যেখানে খোলা আকাশের নিচে নিজেদের প্রয়োজন সারে, সেখানে শূকর-ই সেগুলো খেয়ে পরিষ্কার করে ফেলে। কেউ যুক্তি দিতে পারে যে, উন্নত দেশগুলোতে আজকাল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন জায়গায় এবং স্বাস্থ্যসম্মত পন্থায় শূকর প্রতিপালন করা হয়। এসব স্বাস্থ্যসম্মত খামারগুলোতেও শূকরগুলোকে গাদাগাদি করেই রাখা হয়। আপনি তাদেরকে যত পরিচ্ছন্নই রাখতে চান না কেন, এ প্রাণী প্রকৃতিগতভাবেই নোংরা। এগুলো খুব আনন্দের সাথে নিজেদের ও সঙ্গীদের বিষ্ঠা ও মলমূত্র চোখ নাক দিয়ে নাড়াচাড়া করে খেয়ে থাকে।

৬. শূকর সবচেয়ে নির্লজ্জ প্রাণী

শূকর হলো এ পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্য নির্লজ্জ প্রাণী। এটাই একমাত্র পশু যা তার স্ত্রীর সাথে সংগম করার জন্য অন্য সঙ্গীদের ডেকে আনে। আমেরিকার অধিকাংশ অধিবাসী শূকরের মাংস খেতে অভ্যস্ত। যার ফলে বিভিন্ন নৃত্যানুষ্ঠানে তারা অপরের সাথে স্ত্রী বদল করে নেয়। অর্থাৎ অনেকে বলে যে 'তুমি আমার স্ত্রীর সাথে ঘুমাও আমি তোমার স্ত্রীর সাথে ঘুমাই।'

আপনি যদি শূকর মাংস খেতে অভ্যস্ত হন, তাহলে আপনার আচরণও শূকরের মতো হবে। আমরা ভারতীয়রা উন্নত ও রুচিবান হওয়ার জন্য আমেরিকাকে অনুসরণ করি। তারা যা কিছুই করুক না কেন, আমরা তা বেশ কিছু দিন পর্যন্ত অনুসরণ করতে থাকি। আয়ল্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের মর্ম অনুসারে বোম্বের উঁচুস্তরের লোকদের মধ্যে স্ত্রী বদলের এ ব্যাপারটা নিত্য নৈমিত্তিক ও সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১২. মদপানের নিষিদ্ধতা

প্রশ্ন ১২। ইসলামে মদপান ও এর ব্যবহার কেন নিষিদ্ধ করা হয়েছে?

উত্তর : স্মরণাতীত কাল থেকেই মানবজাতির যন্ত্রণার কারণ হিসেবে অ্যালকোহল বা মদকেই দায়ী করা হয়ে আসছে। এটা অগণিত মানুষের দুর্দশার কারণ। অসংখ্য মানুষের অকাল মৃত্যুর কারণ এবং বিশ্বজুড়ে আতঙ্কজনক দুর্দশার কারণ হিসেবেও চিহ্নিত হয়ে আসছে। সমাজে অনেক সমস্যার মূল কারণ হলো মদপান। বিরাজমান পরিসংখ্যানগত দিক থেকে জঘন্য অপরাধের ক্রমবর্ধমান হারে মানসিক রোগীর সংখ্যা এতো প্রবৃদ্ধি এবং বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি ভগ্ন সংসার বিশ্বব্যাপী মদের ধ্বংসযজ্ঞের চাক্ষুষ প্রমাণ বহন করছে।

১. কুরআন মাজীদে মদের নিষিদ্ধতা

আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে মদের ভোগ-ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ـ

অর্থ : ওহে যারা ঈমান এনেছো! মদ, জুয়া, পূজার বেদী এবং ভাগ্য নির্দেশক তীর— এসব নোংরা অপবিত্র শয়তানের কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং তোমরা এসব থেকে বেঁচে থাকো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। (সূরা মায়েদা : ৯০)

২. বাইবেলে মদপানের নিষিদ্ধতা

বাইবেলের নিম্নোক্ত শ্লোকসমূহে মদপানের নিষিদ্ধতা ঘোষিত হয়েছে :

(a) Wine is a mocker, strong drink is raging and whosoever is deceived is not wirse.

অর্থ : 'মদ হলো প্রতারক, কঠিন পানীয়, যা মন্দ কাজের উদ্দীপক এবং যে এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়লো, সে জ্ঞানীর পরিচয় দিল না।' (দাইবেল, নীতিবাক্য ২০ : ১)

(b) and be not drink with wine. মদ্যপান করে মাতাল হয়োনা।' [এসিয়ান্স ৫ : ১৮]

৩. মদপান বিবেকের ভূমিকা পালনে বাধা দেয়

মানুষের মস্তিষ্কে একটি বিবেচনা কেন্দ্র রয়েছে, যাকে আমরা বিবেক বলি। বিবেক মানুষকে এমন কাজ করতে বাধা দেয়, যে কাজকে সে মন্দ বলে মনে করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, সাধারণত কোনো ব্যক্তি মাতা-পিতা ও বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্বোধন করার সময় অশালীন ভাষা ব্যবহার করে না। কারণ তার বিবেক তাকে এটা হতে বাধা দেয়। কেউ যদি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে চায় তার বিবেক তাকে জনসমক্ষে এ কাজ করতে বাধার সৃষ্টি করে, তাই সে টয়লেট তালাশ করে।

আর যখন কোন ব্যক্তি মদপান করে, তখন তার বিবেক স্বয়ং অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। মদপানকারীকে অস্বাভাবিক আচরণ করতে যে দেখা যায়, তার মূল কারণ এটাই। এমনকি মাতাল ব্যক্তি যখন তার মাতাপিতার সাথে কথা বলে, তখনো সে তাদের সাথে অসম্মানজনক আচরণ করতে থাকে; সে তার ভুল বুঝতে পারে না। ভালো-মন্দ বিবেচনার শক্তি তার লোপ পেয়ে যায়। মাতাল হয়ে অনেকে নিজের পরিধানের পোশাকে পেসাব করে দেয়। মাতাল অবস্থায় সে ভালোভাবে কথা বলতে বা হাঁটতে পারে না। এমনকি তারা মানুষের সাথে মন্দ আচরণ করে।

৪. ব্যভিচার, ধর্ষণ, নিষিদ্ধ মহিলাকে ধর্ষণ এবং এইডস্ ইত্যাদি মদ্যপায়ীদের মধ্যেই দেখা যায়

'আমেরিকার ন্যাশনাল ক্রাইম ভিকটিমাইজেশন সার্ভে ব্যুরো অব জ্যাস্টিস' (US, Department of Justice)-এর জরিপ অনুসারে কেবল ১৯৯৬ সালে সেখানে গড়ে প্রতি দিন ২,৭১৩টি ধর্ষণের ঘটনা রেকর্ড করা হয়। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, অধিকাংশ ধর্ষক এ ঘটনার সময় মাতাল ছিল। নারী উৎপীড়নের ক্ষেত্রেও একই প্রতিবেদন পাওয়া যায়।

পরিসংখ্যান অনুসারে শতকরা আট ভাগ আমেরিকান তাদের নিষিদ্ধ আত্মীয়কে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত। এমনকি মা, বোন, কন্যাও এদের হাত থেকে রেহাই পায় না অর্থাৎ প্রতি ১২ কি ১৩ জনের মধ্যে একজন নিষিদ্ধ আত্মীয়কে ধর্ষণের সাথে জড়িত। এসব ঘটনার প্রায় সবই তাদের একজনের বা উভয়ের মদ পানের ফলে সংঘটিত হয়ে থাকে।

মারাত্মক প্রাণঘাতি রোগ এইডস্ বিস্তারের প্রধান কারণ মদপান। সুতরাং মদপানই একটি মারাত্মক ও প্রাণঘাতি ব্যাধি।

৫. প্রত্যেক মদপায়ী-ই প্রথম দিকে শখ করে মদপান করে থাকে

মদপানের পক্ষে অনেকেই যুক্তি দেখাতে চান এবং মদ্যপায়ীদেরকে সামাজিক পানকারী বলে চালিয়ে দিতে চান। তারা বলতে চান যে, তারা কোনো পার্টিতে হয়তো এক চুমুক বা দু চুমুক পান করেন এবং তারা কখনো মাতাল হন না। তাদের নিজেদের উপরে নিয়ন্ত্রণ থাকে। দীর্ঘ অনুসন্ধানের ফলাফল থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক মদপায়ীই প্রাথমিক পর্যায়ে সৌখিন পানকারী ছিল। একজন মদপায়ীও শুরু থেকে মাতাল হওয়ার জন্য মদপান শুরু করে নি। এমন একজন সৌখিন মদপায়ীও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে বলতে পারে যে, আমি দীর্ঘদিন থেকেই দু-এক পেয়ালা করে মদপান করে এসেছি, কিন্তু আমি কখনো সীমা ছাড়াই নি এবং মাতাল হই নি।

৬. জীবনে কেউ মাতাল হয়ে লজ্জাকর কোনো কাজ করলে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাকে তা যন্ত্রণা দেবে

ধরা যাক একজন সৌখিন মদ্যপায়ী একবার মাত্র নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। তখন মাতাল অবস্থায় কোনো নারীকে ধর্ষণ করেছিল, অথবা কোনো নিষিদ্ধ আত্মীয়াকে ধর্ষণ করেছিল। এর জন্য তাকে যদি দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চাইতে হয় এবং ক্ষমা পেয়েও গিয়ে থাকে, তবুও একজন স্বাভাবিক মানুষকে এ লজ্জাকর ঘটনার দুঃসহ স্মৃতি সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হয়। ধর্ষক এবং ধর্ষিতা উভয়কেই এ অপূরণীয় ও অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করে যেতে হয়।

৭. হাদীসে মদপানের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে

ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন—

ক. সুনানে ইবনে মাজার ভলিউম-৩ মাতলামি' ৩০ নং অধ্যায়ের হাদীস নং ৩৬৭১।

অর্থ : "মদই-হলো সকল মন্দের মা তথা মূল এবং এটা সবচেয়ে লজ্জাকর ও মন্দ।"

খ. উল্লিখিত অধ্যায়ের ৩.৩৯২ নং হাদীসে আছে, "মাদকতা উৎপাদন করে তার বেশি পরিমাণ যেমন নিষিদ্ধ, তার কম পরিমাণও নিষিদ্ধ।'

সুতরাং এক ঢোক বা এক ড্রাম কোনোটাই ক্ষমাযোগ্য নয়।

গ. শুধু মদ পানকারীর উপরই আল্লাহর লানত তথা অভিশাপ নয়; বরং যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের সহযোগিতা করে, তাদের উপরও আল্লাহর অভিশাপ। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

অর্থ : দশ শ্রেণীর লোকের ওপর আল্লাহর অভিশাপ যারা মদের সাথে জড়িত।

১. যারা চোলাই করে, ২. যার জন্য মন্দ চোলাই করা হয়, ৩. যে মদ পান করে, ৪. যে মদ বহন করে, ৫. যার জন্য মদ বহন করে নেয়া হবে, ৬. যে মদ পরিবেশন করে, ৭. যে মদ বিক্রয় করে, ৮. যে মদ বিক্রিত টাকা ব্যবহার করে, ৯. যে মদ ক্রয় করে এবং ১০. যার জন্য মদ ক্রয় করা হয়।

৮. মদপানের সাথে যেসব রোগ জড়িত

মদপান নিষিদ্ধ করার পেছনে বেশকিছু বৈজ্ঞানিক কারণ রয়েছে। পৃথিবীতে যেসব কারণে মানুষের মৃত্যু হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু মদপানের সাথে সম্পর্কিত। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ শুধু মদপানের কারণে অকালে ঝরে যায়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত বলার অপেক্ষা রাখেনা। কেননা, এর কুফল সম্পর্কে সর্বসাধারণ অবহিত। নিম্নে মদপান জনিত কারণে যেসব রোগ হয়, তার সংক্ষিপ্ত তালিকা দেয়া হলো—

১. লিভার সিরোসীস, যাতে কলিজা শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়।

২. বিভিন্ন ধরনের ক্ষতরোগ বা ক্যান্সার, অন্ননালীর ক্যান্সার, মস্তিষ্কে ক্ষতজনিত প্রদাহ, গলার অভ্যন্তরে ক্যান্সার, লিভার ক্যান্সার (Hepatoma),মল-নালীর ক্যান্সার ইত্যাদি।

৩. অন্ননালী, কণ্ঠনালী, পাকস্থলির প্রদাহ, হজমি শক্তি কমে যাওয়া যকৃতের প্রদাহ ইত্যাদি রোগ মদপানের কারণে হয়ে থাকে।

৪. হৃদযন্ত্রের যাবতীয় রোগ যেমন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া, হৃদকম্পন, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদির সাথে মদপানের সম্পর্ক রয়েছে।

৫. হৃদপিণ্ডের রক্তসঞ্চালন নালীর যাবতীয় রোগ যে জন্য হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়, ফিট হয়ে যাওয়া ও গলনালীর প্রদাহ ইত্যাদিও অধিকাংশ মদপানজনিত কারণে হয়ে থাকে।

৬. বিভিন্ন প্রকার প্যারালাইসিসের অধিকাংশ মদপানের প্রতিক্রিয়ায় হয়ে থাকে।

৭. মস্তিষ্কের যাবতীয় জটিল রোগ এবং স্নায়ুর যাবতীয় রোগ অধিকাংশই মদপানের কুফল।

৮. বেরিবেরি এবং শরীরের প্রয়োজনীয় উপাদানের শূন্যতাজনিত অনেক রোগই মদপানের ফলে হয়ে থাকে।

৯. যাবতীয় চর্মরোগ মদপানের ফলে হয়ে থাকে।

[মদপানের কারণে আরো যেসব রোগের উৎপত্তি হয়, সেসব রোগের তালিকা অত্যন্ত দীর্ঘ। এছাড়া এসব রোগের নাম বাংলায় ভাষান্তর করতে হলে প্রত্যেক রোগের পরিচয় দিতে টীকা সংযোজন করতে হবে। যার ফলে বইয়ের কলেবর অনেক বৃদ্ধি পাবে বিধায় এখানে সমাপ্ত করা হলো। — অনুবাদক]

১০. মাদকাসক্তি স্বয়ং একটি রোগ।

চিকিৎসা বিজ্ঞানিগণ মদপানকে আর মাদকাসক্তি না বলে এটাকে স্বয়ং একটি রোগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

ইসলামি রিসার্চ ফাউন্ডেশন সম্প্রতি একটি প্রচারপত্রে উল্লেখ করেছে যে, মদ যদি একটি রোগই হয়ে থাকে, তবে এটাই একমাত্র রোগ যায় —

১. বোতলের মাধ্যমে বাজারজাত করা হয়।

২. পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, রেডিও ও টেলিভিশনে যার প্রচার করা হয়।

৩. যার প্রচার-প্রসারের জন্য শুল্ক নিয়ে লাইসেন্স পারমিট দেয়া হয়।

৪. যার মাধ্যমে সরকার রাজস্ব লাভ করে।

৫. যার মাধ্যমে রাজপথে মৃত্যুর আগমন হয়।

৬. যার কারণে পারিবারিক জীবন ধ্বংস হয়ে যায় এবং অপরাধ বাড়ে।

৭. যার কোনো জীবাণু নেই অথবা আনুষঙ্গিক কারণ নেই।

মাদকাসক্তি কোনো রোগ নয়— এটা শয়তানের কারসাজি।

মহান আল্লাহ যিনি অনন্ত জ্ঞানের মালিক, তিনি শয়তানের এই লোভনীয় ফাঁদ থেকে আমাদেরকে সর্তক করে দিয়েছেন। ইসলামকে 'দীনুল ফিতরাহ' তথা মানুষের জন্য স্বভাবসম্মত জীবন-ব্যবস্থা বলা হয়েছে। ইসলামের যাবতীয় বিধি নিষেধ মানব কল্যাণের লক্ষ্যেই প্রদত্ত হয়েছে। যাতে করে মানুষের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক অবস্থান সংরক্ষিত থাকে। মদপান হলো মানুষের প্রকৃতিগত অবস্থান থেকে বিচ্যুতি। এটা ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, একটি সমাজের জন্যও প্রযোজ্য। মদপান মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে দেয়। অথচ মানুষের দাবি হলো তারা শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। আর এজন্যই ইসলামে মদ পানকে হারাম তথা নিষিদ্ধ ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

১৩. নর-নারীর সাক্ষ্যের সমতা

প্রশ্ন ১৩। দু' জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান কেন?

উত্তর : দু' জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান –এটা সত্য নয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটা সত্য। আল-কুরআনের ন্যূনপক্ষে ৫টি আয়াতে নারী-পুরুষ কারো উল্লেখ ব্যতীত সাক্ষ্যদান সংক্রান্ত আলোচনা এসেছে। তার মধ্যে একটি মাত্র আয়াতে বলা হয়েছে যে, একজন পুরুষের সাক্ষ্য দু' জন নারীর সাক্ষ্যের সমান। আর তা হলো সূরা আল-বাকারার ২৮২ নং আয়াত। এটা কুরআন মাজীদের দীর্ঘতম আয়াত। এতে অর্থনৈতিক লেনদেন সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। এতে বলা হয়েছে—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ـ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ـ وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ـ فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْلاَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ـ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ـ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى ..... ـ

অর্থ : ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা যখন নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের লেনদেন কর। তখন তা লিখে রেখো; তোমাদের মধ্যে কোনো লোক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখে দেয়। লেখক যেন লিখতে অস্বীকার না করে, যেহেতু আল্লাহ তাকে লেখতে শিখিয়েছেন; সুতরাং সে যেন লিখে দেয়। আর ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে আর তাতে যেন বিন্দুমাত্র কম না করে। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে, তবে যেন অভিভাবক লেখার বিষয়বস্তু ন্যায়সঙ্গতভাবে বলে দেয়। আর দু' জন সাক্ষী রাখবে তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে তবে যদি দু' জন পুরুষ পাওয়া না যায়, তবে একজন পুরুষ ও দু' জন মহিলা ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর, তাদের একজন ভুল করলে অপরজন তা স্মরণ করিয়ে দেবে। (সূরা বাকারা : ২৮২)

কুরআন মাজীদের উল্লিখিত আয়াতে অর্থনৈতিক লেনদেন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে একটি লিখিত চুক্তি করার জন্য দু' পক্ষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং দু' জন সাক্ষী রাখার নির্দেশও দান করা হয়েছে। এতে সাক্ষী দু' জন পুরুষ হওয়াকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। যদি দু' জন পুরুষ সাক্ষী পাওয়া না যায়, তাহলে একজন পুরুষ ও দু' জন নারী সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, কোনো লোক কোনো বিশেষ অসুবিধার জন্য অপারেশন করাতে ইচ্ছে করল। তার চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য সে দু' জন অভিজ্ঞ সার্জনের পরামর্শ গ্রহণ করবে। কিন্তু কোনো কারণে সে যদি দু' জন সার্জন

খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়, তখন সে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে একজন অভিজ্ঞ সার্জনের সাথে দু'জন সাধারণ এম. বি. বি. এস. ডাক্তারের পরামর্শ নেবে।

একইভাবে অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রেও দু' জন পুরুষ সাক্ষীকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। ইসলাম আশা করে যে, নিজেদের পরিবারের ভরণ পোষণের দায়-দায়িত্ব পুরুষরাই বহন করবে। যেহেতু অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব পুরুষরাই বহন করে থাকে। তাছাড়া অর্থনৈতিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে নারীদের তুলনায় পুরুষরা অধিক দক্ষ। এটাই আশা করা হয়ে থাকে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে একজন পুরুষ ও দু' জন নারীকে সাক্ষী হিসেবে রাখার পরামর্শ দেয়া হয়েছে যাতে নারীদের একজন যদি ভুল করে অন্যজন যেন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। কুরআন মাজীদে এক্ষেত্রে 'তাদিল্ল' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ তাল পাকিয়ে ফেলা বা ভুল করা। অনেকে এ শব্দের ভুল অর্থ করে যে, এর অর্থ ভুলে যাওয়া। সুতরাং একমাত্র অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রেই একজন পুরুষের সাক্ষীকে দু' জন নারীর সাক্ষ্যের সমতুল্য করা হয়েছে।

যা হোক, ইসলামি আইনে কতেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, হত্যা মামলায় সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রেও নারীসুলভ দুর্বলতা প্রভাব ফেলতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে নারীরা পুরুষের তুলনায় বেশি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। নারীরা তাদের আবেগপ্রবণতার জন্য হত্যা মামলায় সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে সংশয়িত হয়ে যেতে পারে। এজন্যই ইসলামি আইনে বিশেষজ্ঞগণ হত্যা মামলায় সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে একজন পুরুষের সমান দু' জন নারী— রায় দিয়েছেন। এছাড়া অন্য সকল মামলায় একজন পুরুষের সাক্ষ্য একজন নারীর সমান। কুরআন মাজীদে পাঁচ স্থানে পুরুষ নারী-কোনটা উল্লেখ না করে সাক্ষ্যদানের বিষয় আলোচিত হয়েছে।

উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে উইল প্রস্তুত কালে দু' জন ন্যায়বান ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখা আবশ্যক। সূরা আল মায়েদায় বলা হয়েছে—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهٰدَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَاعَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ .....

অর্থ : হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের মধ্যে যখন কোনো ব্যক্তির মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তোমাদের অসিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে দু' জন

ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা সফলে থাকলে এবং তোমাদের মৃত্যু বিপদ, উপস্থিত হলে তোমাদের ছাড়া অন্য লোকেদের মধ্য হতে দুই জন সাক্ষী মনোনীত করবে। (সূরা মায়েদা : ১০৬)

অন্যত্র বলা হয়েছে–

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْفَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ ـ وَاَقِيْمُوا الشَّهٰدَةَ لِلّٰهِ ـ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ ـ

অর্থ : তাদের ইদ্দত পূরণের কাল আসন্ন হলে তোমরা হয় যথাবিধি তাদেরকে রেখে দিবে, না হয় তাদেরকে যথাবিধি পরিত্যাগ করবে এবং তোমাদের মধ্য হতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে, আর তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিবে, এ দ্বারা তোমাদের উপদেশ দেয়া হচ্ছে। (সূরা তালাক : ২)

যৌন অপরাধের সাক্ষী সম্বন্ধে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ـ

অর্থ : আর যারা কোনো সতী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপরে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। এরাই প্রকৃত ফাসিক। (সূরা নূর : ৪)

বেশ কিছু ইসলামি বিশেষজ্ঞ আলিমের মতে, একজন পুরুষের সাক্ষ্য দু'জন স্ত্রী লোকের সমান এ বিধান সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অবশ্য এ মতামত সকলে সমর্থন করেন না। কারণ কুরআন মাজীদের সূরা নূরের একটি আয়াতে আল্লাহ সুস্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, একজন পুরুষের সাক্ষ্য একজন নারীর সমান। যেমন বলা হয়েছে—

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ـ

অর্থ : আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং নিজেরা ছাড়া তাদের আর কোনো সাক্ষী থাকে না, তখন সে আল্লাহর নামে চার বার কসম করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী। (সূরা নূর : ৬)

হযরত আয়েশা (রা)-এর মতে, একক সাক্ষী হাদীসের বিশুদ্ধতায় গ্রহণযোগ্য

ইসলামি আইনে বিশেষজ্ঞদের অনেকেই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন যে, চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজন মুমিন নারীর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। ভেবে দেখুন ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি রোযা। সেই রোযার ব্যাপারে একজন নারীর সাক্ষ্য মুসলিম জনগোষ্ঠির কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কতেক বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করেন যে, রমযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজন সাক্ষী এবং রমযানের শেষে ঈদের চাঁদ দেখার ব্যাপারে দু'জন সাক্ষী প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সাক্ষীদের পুরুষ বা না নারী হওয়ার ব্যাপারে কোনো শর্ত নেই।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য অগ্রগণ্য, সেক্ষেত্রে কোনো পুরুষ গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষ করে যখন সমস্যাটি মহিলাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন : কোনো মহিলার মৃতদেহের গোসল দেয়ার সাক্ষ্য একজন নারীর পক্ষেই দেয়া সম্ভব।

অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সাম্যের ব্যাপারে যে ইসলামে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তা লিঙ্গ বৈষম্যের জন্যে নয়; বরং তা সমাজে নারী পুরুষের প্রকৃতি ও ভূমিকার পার্থক্যের কারণে।

১৪. উত্তরাধিকার আইন

প্রশ্ন ১৪। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি বা মিরাসের ক্ষেত্রে ইসলামি আইনে নারীর অংশ পুরুষের অর্ধেক কেন?

উত্তর : মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে যথার্থ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে মিরাসি সম্পদ বণ্টনের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে।

আল-কুরআনের যেসব সূরা ও আয়াতে এ সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ—

১. সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৮০, ২. সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৪০, ৩. সূরা আন-নিসা, আয়াত ৭—৯, ৪. সূরা নিসা, আয়াত ১৯, ৫. সূরা নিসা, আয়াত ৩৩, ৬. সূরা আল-মায়েদা, আয়াত ১০৬—১০৮।

নিম্নোক্ত তিনটি আয়াতে আত্মীয়দের অংশ সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে—

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ ـ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ط وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ـ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ـ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ـ فَاِنْ كَانَ لَهٗ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىْ بِهَا اَوْ دَيْنٍ ـ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ـ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ـ

অর্থ : আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে তোমাদেরকে আদেশ করেন : এক পুত্রের অংশ দু' কন্যার সমান; তবে যদি শুধু কন্যা থাকে দু' জনের অধিক তা হলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দু' ভাগ। আর যদি কন্যা একজন থাকে তবে তার জন্য অর্ধেক। যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে, তাহলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেক পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের একভাগ পাবে। আর যদি সে নিঃসন্তান হয় এবং তার পিতা মাতাই ওয়ারিস হয়, তাহলে মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ; কিন্তু যদি তার ভাই বোন থাকে, তবে মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ–এসবই মৃত ব্যক্তি যে অসিয়ত করে গেছে তা দেয়ার পরে ও ঋণ পরিশোধ করার পরে। তোমাদের পিতা ও তোমাদের সন্তানদের মধ্যে উপকারের দিক থেকে কারা তোমাদের নিকটতর, তা তোমরা জানোনা— এ ব্যবস্থা আল্লাহর তরফ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ হিকমতওয়ালা।

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ـ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ ـ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ـ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ ـ وَاِنْ

كَانَ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ لَهٗ وَلَهٗ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَاِنْ كَانَ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا اَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ـ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ـ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ـ

অর্থ : আর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে, যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে, তবে যদি তাদের সন্তান থাকে, তাহলে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ পাবে অসিয়ত পালন ও ঋণ পরিশোধের পর। আর তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির চারভাগের একভাগ পাবে যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে, আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তাহলে ওরা তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ পাবে—তোমরা যে অসিয়ত করবে, তা দেয়া ও ঋণ পরিশোধ বরার পরে, যদি পিতা-মাতা ও সন্তানহীন কোনো পুরুষ বা নারী মারা যায়, এ অবস্থায় যে, তার এক বৈপিত্রেয় ভাই অথবা এক বৈপিত্রেয় তার কোনো উত্তরাধিকারী, তবে তারা প্রত্যেকে পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ; কিন্তু তারা যদি এর অধিক হয়, তবে তারা তিনভাগের একভাগ সমান অংশীদার হবে তার অসিয়ত পালন ও ঋণ পরিশোধ করার পর। অসিয়ত যেন কারো জন্য ক্ষতিকর না হয়, এটা আল্লাহর বিধান। আর আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

পবিত্র আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

يَسْتَفْتُوْنَكَ ـ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ـ اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ـ وَهُوَ يَرِثُهَا اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ـ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ثُلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ـ وَاِنْ كَانُوْا اِخْوَةً رِّجَالاً وَّنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ـ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ـ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ـ

অর্থ : তারা আপনার কাছে বিধান জানতে চায়, আপনি বলুন, আল্লাহ তোমাদেরকে বিধান দিচ্ছেন 'কালালা' (পিতৃমাতৃহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি) সম্পর্কে—যদি কোনো ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় (তার পিতা-মাতাও না থাকে) এবং তার

এক বোন থাকে, তবে সে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে। আর যদি সে সন্তানহীনা হয়, তবে তার ভাই তার ওয়ারিস হবে। তবে যদি কোনো দু জন থাকে, তাহলে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর যদি ভাই-বোন কয়েকজন থাকে, তবে একপুরুষের অংশ দুই নারীর সমান হবে। তোমরা বিভ্রান্ত হবে এ আশঙ্কায় আল্লাহ তোমাদের জন্য পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন, আর আল্লাহ কার্য বিষয়ে সর্বজ্ঞ। [সূরা নিসা : ১৭৬]

অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী তার বিপক্ষ পুরুষের তুলনায় মিরাসি সম্পত্তির অর্ধেক পেয়ে থাকে। তবে এটা সকল ক্ষেত্রেই নয়। আর যদি মৃত ব্যক্তি পিতা-মাতা ও সন্তান বিহীন হয়ে থাকে এবং তার মাত্র একটি বৈপিত্রেয় ভাই ও একটি বৈপিত্রেয় বোন থাকে। তবে তারা উভয়ে ছয় ভাগের এক ভাগ সম্পত্তি পাবে। যদি মৃতের পুত্র-কন্যা থাকে, তবে মাতা-পিতা উভয়ে ছয় ভাগের এক ভাগ করে পাবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের দ্বিগুণ সম্পত্তি পায়। মৃত ব্যক্তি যদি এমন নারী হয়ে থাকে যার পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন কেউ না থাকে, শুধু স্বামী ও মাতাপিতা থাকে, এ অবস্থায় স্বামী পাবে সম্পত্তির অর্ধেক সম্পত্তি, মা পাবে তিন ভাগের একভাগ ও বাবা পাবে ছয় ভাগের একভাগ। এক্ষেত্রে নারী তার পুরুষ প্রতিপক্ষ তথা পিতার চেয়ে দ্বিগুণ অংশ পাবে। এটা সত্য যে, সাধারণভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের চেয়ে অর্ধেক মিরাস পায়। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে উক্ত বিধানই কার্যকর।

ক. পুত্রসন্তান যা পায় কন্যা তার অর্ধেক পায়।

খ. মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকা অবস্থায় স্ত্রী পায় আট ভাগের একভাগ, মৃত ব্যক্তি নারী হলে সন্তান না থাকা অবস্থায় স্বামী পায় চার ভাগের এক ভাগ।

গ. মৃতের সন্তান থাকলে স্ত্রী পাবে চার ভাগের এক ভাগ এবং স্বামী পায় দু ভাগের এক ভাগ।

ঘ. মৃতের যদি মাতা-পিতা ও সন্তান না থাকে, তাহলে ভাই যা পাবে বোন পাবে তার অর্ধেক।

ইসলামে নারীর ওপর এমন কোনো অর্থনৈতিক বাধ্য-বাধকতা ও দায়-দায়িত্ব নেই, যা ন্যস্ত আছে পুরুষের কাঁধে। বিয়ের আগে নারীর অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান সব কিছুর দায়িত্ব থাকে পিতা ও ভাইদের ওপর। বিয়ের পরে উপরিউক্ত দায়িত্ব বর্তায় স্বামী এবং ছেলেদের ওপর। পরিবারের আর্থিক প্রয়োজন পূরণের দায়-দায়িত্ব ইসলাম পুরুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এসব দায়-দায়িত্ব পূরণ তাকে যোগ্য করে তোলার জন্য তাকে উত্তরাধিকারের অংশ দ্বিগুণ করে দেয়া হয়েছে। যেমন : এক ব্যক্তি তার এক ছেলে ও এক মেয়ের জন্য এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা রেখে মারা

গেল এ অবস্থায় ছেলে পাবে এক লক্ষ টাকা এবং মেয়ে পাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা। কিন্তু পরিবারের সর্বপ্রকার আর্থিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব পুত্রের ওপর ন্যস্ত।

অতএব দেখা গেল সেসব প্রয়োজন পূরণে তার প্রায় সব টাকাই খরচ হয়ে যায়। ধরা যাক, তার এক লক্ষ টাকার মধ্যে আশি হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল, তাহলে বাকি থাকল বিশ হাজার টাকা। ফলে দেখা গেল যে, ছেলে এক লক্ষ টাকা পেয়েও তার টিকল মাত্র বিশ হাজার টাকা। অপরদিকে মেয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়ে কোনো খরচ না থাকাতে পঞ্চাশ হাজার টাকাই গচ্ছিত থেকে গেল। কেননা তার এ টাকা থেকে কারো জন্য একটি টাকাও ব্যয় করতে হলো না। এখন যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, একদিকে এক লক্ষ টাকা যার আশি হাজার টাকা ব্যয় হয়ে যাবে, আর অপরদিকে পঞ্চাশ হাজার টাকা যার একটি পয়সাও খরচ হবে না। আপনি কোনটা নেবেন? তাহলে কোনো বোকাও এক লক্ষ টাকা নিতে চাইবে না।

১৫. আল কুরআন আল্লাহর বাণী কিনা?

প্রশ্ন ১৫। আল কুরআন যে আক্ষরিক অর্থেই আল্লাহর বাণী তার প্রমাণ কী?

উত্তর :

১. আল-কুরআন সম্পর্কে মুসলমানদের বিশ্বাস

১৪০০ বছর আগে যখন আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়, তখনই মুসলিম বিশ্বে হিদায়াতের আলো জ্বলে উঠেছিল। মুসলমানদের বিশ্বাসের অপরিহার্য অঙ্গ এই যে, আল-কুরআন আল্লাহর বাণী। এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে বিন্দুমাত্র মতপার্থক্যও নেই। তারা বিশ্বাস করে যে, আল-কুরআনই ইসলামকে পূর্ণতা দান করেছে এবং এর হিফাযতকারী স্বয়ং আল্লাহ। কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ এ কিতাবকে সংরক্ষণ করবেন। কারণ কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক দুনিয়াতে আসবে তাদের সকলের জন্যই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব হিসেবে এ কিতাবের বিধানই প্রযোজ্য।

২. হযরত মুহাম্মাদ ﷺ বিশ্ব মানবতার জন্য রহমত স্বরূপ

মুহাম্মাদ ﷺ মানবজাতির প্রতি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। তিনি দুনিয়াবাসীর জন্য আল্লাহর এক বিরাট রহমতস্বরূপ। আল-কুরআনে আল্লাহ বলেন–

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ -

অর্থ : আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছি। (আল আম্বিয়া : ১০৭)

হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন সর্বশেষ ও চূড়ান্ত রাসূল। তাই তাঁর বাণীও চিরস্থায়ী। অতএব তাঁকে প্রদত্ত মু'জিযা তথা অলৌকিক বিষয়গুলো চিরস্থায়ী এবং

পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত এগুলোর কার্যকারিতা থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রদত্ত অনেক অলৌকিক বিষয় বা ঘটনা রয়েছে, যাতে মুসলমানরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

৩. আল-কুরআন হলো শ্রেষ্ঠ মু'জিযা

আল-কুরআন হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ ﷺ-কে চূড়ান্ত ও শ্রেষ্ঠ মু'জিযা। আল-কুরআন সর্বকালের জন্যই এক অনন্য মু'জিযা। তাই এটাকে 'মুজিযার মুজেযা' বলা যায়। আর এটা প্রমাণিত হয়েছে ১৪০০ বছর আগে।

৪. কুরআনের উৎসের দিক থেকে তিনটি ধারণা ও তার পরীক্ষা

ক. হযরত মুহাম্মাদ ﷺ সচেতন, অর্ধসচেতন বা অবচেতন অবস্থায় নিজেই রচনা করেছেন।

হযরত মুহাম্মাদ ﷺ কখনো এ দাবি করেন নি যে, আল-কুরআন তাঁর নিজের রচিত। তিনি সর্বদা এটাই বলেছেন যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত বাণী। তাঁর একথা অবিশ্বাস করার অর্থ (নাউযুবিল্লাহ) তিনি মিথ্যা বলেছেন। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যে, নবুয়ত লাভের পূর্বে ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি একটি মিথ্যাও বলেন নি। তাঁকে মক্কার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে 'আল-আমিন' অর্থাৎ 'বিশ্বাসী' উপাধি দিয়েছিল। সমসাময়িক সকল মানুষ তাঁকে একজন সৎ, আমানতদার ও সৎচরিত্রের অধিকারী মহৎপ্রাণ ব্যক্তি বলেই জানতো। অথচ নবুয়াত লাভের পর একদল স্বার্থান্বেষী মানুষ তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত করে। এ অবস্থায়ও তাদের সকল মূল্যবান অর্থ-সম্পদ তাঁর কাছেই জমা রাখতো। অতএব এমন একজন মানুষ আল-কুরআনকে আল্লাহর বাণী এবং তিনি একজন নবী— এ সম্বন্ধে মিথ্যা দাবি করতে পারেন না।

দুনিয়াবি স্বার্থে অনেক লোকই নিজেকে সাধক পুরুষ, আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ বা প্রচারক হিসেবে দাবি করে এবং বিপুল সম্পদ অর্জন করে বিলাসবহুল জীবন-যাপন করে। যেমন– ভারতেও এরূপ লোকের সমাগম দেখা যায়। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ ﷺ নবুয়াত লাভের আগে অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক সচ্ছল ছিলেন। তিনি নবুয়াত লাভের ১৫ বছর আগে 'খাদীজা' নাম্নী এক ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত মহিলাকে বিয়ে করেন। অথচ নবুয়াত লাভের পর তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, মাসের পর মাস তাঁর চুলায় আগুন জ্বলে নি। কেননা তাঁর ঘরে রান্না করার মতো কিছু ছিল না। তাঁরা পানি ও খেজুর এবং মদিনাবাসীদের দেয়া দুধ খেয়ে জীবন-যাপন করতেন। এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন চিত্র। হযরত বিলাল (রা) যিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন, তিনি বলেন নবী করীম ﷺ যখনই কোনো দিক থেকে হাদীয়াস্বরূপ কিছু পেতেন, তা গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন এবং কখনো নিজের জন্য রেখে দিতেন না। তাঁর এ জীবন চিত্র থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, তিনি বস্তুগত স্বার্থে কখনো মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারেন না। অতএব

আল-কুরআন আল্লাহর বাণী, যা তাঁর ওপর ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁর এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ঘোষণা করেছে–

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ـ

অর্থ : সুতরাং আফসোস তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে এবং বলে 'এটা আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ', যাতে এর বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য পেতে পারে; কাজেই তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য এবং তারা যা উপার্জন করেছে তার জন্যও। (সূরা আল-বাকারা : ৭৯)

এ আয়াতে তাদের ধ্বংস কামনা করা হয়েছে যারা নিজ স্বার্থে নিজে কিতাব রচনা করে আল্লাহর নামে চালিয়ে দেয়। অতএব আল-কুরআন হযরত মুহাম্মাদ ﷺ নিজে রচনা করেন নি; বরং এটা আল্লাহর বাণী, আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে তাঁর ওপর নাযিল করেছেন।

খ. হযরত মুহাম্মাদ ﷺ কোনো মানুষ থেকে বা কোনো ধর্মগ্রন্থ থেকে আল-কুরআন লাভ করেছেন?

আল-কুরআন সম্পর্কে দ্বিতীয় ধারণা হলো হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এটা অন্য ধর্মগ্রন্থ থেকে নকল করেছেন। অথবা এটা অন্য কোনো মানুষ থেকে সংগ্রহ করেছেন। একটি বিষয় বিবেচনা করলেই এ ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হবে। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ উম্মী বা নিরক্ষর ছিলেন, এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য। পবিত্র কুরআনেও এর সাক্ষ্য রয়েছে–

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلاَ تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لاَّرْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ

অর্থ : আর আপনিতো আগে আর কোনো কিতাব পাঠ করেন নি, এবং নিজের ডান হাত দিয়ে কোনো কিতাব লিখেননি, যাতে অসত্যপন্থীরা কিছু মাত্র সন্দেহ পোষণ করতে পারে। (সূরা আনকাবূত : ৪৮)

অতএব এটা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল-কুরআন অন্য কোনো উৎস তথা অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ বা কোনো মানব উৎস থেকে সংগ্রহ করেন নি, বরং এটা

আল্লাহর বাণী, যা তিনি তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ করেছেন ওহীর মাধ্যমে।

আল-কুরআনে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে–

الٓمّٓ ـ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لاَ رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ـ

অর্থ : 'আলিফ, লাম, মীম' এ কিতাব বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তারা কি বলে যে, এটাতো সে নিজে রচনা করে নিয়েছে? বরং এটাতো আপনার রবের পক্ষ থেকে আগত সত্য। যেন আপনি এমন লোকদের সতর্ক করতে পারেন, যাদের কাছে আপনার আগে কোনো সতর্ককারী আসেনি। সম্ভবত তারা সৎপথ পেয়ে যাবে। (আল-কুরআন ৩২ ঃ ১-৩)

গ. আল-কুরআন মানব রচিত নয়– এটা আক্ষরিক অর্থেই আল্লাহর বাণী : আল-কুরআনের উৎস সম্পর্কে তৃতীয় এবং সঠিক ধারণা হলো এটা কোনো মানুষ রচনা করেনি; বরং এটা মহাবিশ্বের স্রষ্টা, প্রতিপালক, পরিচালক ও মালিক মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাঁর প্রিয়তম রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি দুনিয়ার মানুষকে সঠিক পথ দেখাবার জন্য অবতারিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব।

[কুরআন মাজীদ যে, আল্লাহর বাণী সে সম্পর্কে ডা. জাকির নায়েকের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। আর সে আলোচনা Is the Quran Gods Words নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলায় যা 'কুরআন কি আল্লাহর বাণী' নামে প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে সেখান থেকে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করা হলো। – অনুবাদক।]

১৬. আখিরাত–তথা মৃত্যু পরবর্তী জীবন

প্রশ্ন ১৬ : আখিরাত তথা মৃত্যুর পরবর্তী কোন জীবন আছে, তার প্রমাণ কী?

উত্তর :

১. মৃত্যুর পরে জীবন আছে তা অন্ধ বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়

অনেক মানুষ আশ্চর্য বোধ করে যে, এ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে একজন সচেতন মানুষ কিভাবে মৃত্যুর পরে আর একটি জীবন আছে'— একথা বিশ্বাস করতে পারে?

আখিরাতে অবিশ্বাসীরা মনে করে, যারা মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাস করে, তারা অবশ্যই অন্ধভাবে এ বিশ্বাস পোষণ করে। তবে আমার আখিরাতে বিশ্বাস যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত— অন্ধবিশ্বাস নয়।

২. আখিরাত একটি যুক্তিনির্ভর বিশ্বাস

আল-কুরআনের এক হাজারের অধিক আয়াতে বর্ণিত বিষয়াদি বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে প্রমাণিত। (এ বিষয়ে আমার রচিত 'কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান সামঞ্জস্যপূর্ণ অথবা অসামঞ্জস্যপূর্ণ' দ্রষ্টব্য) কুরআনে বর্ণিত অনেক সত্যই গত কয়েক শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত এতদূর অগ্রসর হতে পারে নি যে, কুরআনে বর্ণিত সব বিষয়ই সত্য বলে প্রমাণ করতে সক্ষম হবে।

ধরা যাক, কুরআনে বর্ণিত বিষয়সমূহের শতকরা ৮০ ভাগ ১০০% সত্য বলে প্রমাণিত। বাকি ২০ ভাগ সম্পর্কে বিজ্ঞানের এখন পর্যন্ত কোনো মন্তব্য নেই। কারণ এখন পর্যন্ত বিজ্ঞান সে পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয় নি যাতে যেসব বিষয়কে সত্য বা মিথ্যা বলে প্রমাণ করা যায়। অতএব সেই ২০ ভাগ-এর একটি আয়াত সম্পর্কেও আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে আমরা নিশ্চিত যে, আমরা তা মিথ্যা একথা বলতে পারিনা। সুতরাং কুরআনের শতকরা ৮০ ভাগ যেখানে শতকরা ১০০ ভাগ সত্য বলে প্রমাণিত এবং বাকি ২০ ভাগ এখনো অপ্রমাণিত, সেখানে যুক্তি বলে যে, সেই ২০ ভাগও সত্য হবে। আখিরাত তথা পরকালের অস্তিত্বও সেই ২০ ভাগের অন্তর্গত একটি সত্য, যা যুক্তির নিরিখে সত্য বলেই প্রমাণিত হবে।

৩. শাস্তি ও মানবিক মূল্যবোধসমূহের ধারণা পরকালের ধারণা ছাড়া অর্থহীন

ডাকাতি করা ভালো কাজ না মন্দ কাজ? এ প্রশ্নের জবাব একজন সাধারণ ভারসাম্যপূর্ণ মানুষও বলবে যে, এটা মন্দ কাজ। যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তেমন এক ব্যক্তি একজন শক্তিমান ও প্রভাবশালী অপরাধীকে 'ডাকাতি মন্দ কাজ' একথা কেমন করে বোঝাতে সক্ষম হবে?

মনে করুন, আমি বিশ্বের মধ্যে একজন অত্যন্ত শক্তিশালী অপরাধী। একই সাথে আমি বুদ্ধিমান ও যুক্তিতে বিশ্বাসী একজন মানুষও বটে। আমি বলি যে, ডাকাতি একটি ভালো কাজ। কারণ এটা আমাকে বিলাসী জীবন-যাপনে সাহায্য করে। সুতরাং ডাকাতি আমার জন্য ভাল কাজ।

ডাকাতি আমার জন্য মন্দ হওয়ার পক্ষে কেউ যদি আমার সামনে একটি যুক্তিও পেশ করতে পারে, আমি তা হলে ডাকাতি সাথে সাথে ছেড়ে দেবো। মানুষ সাধারণত যেসব যুক্তি পেশ করে থাকে, সেগুলো হলো—

ক. যার সম্পদ ডাকাতি হয়ে গেছে সে সমস্যার সম্মুখীন হবে

কেউ হয়ত যুক্তি দেবে যে, যার ডাকাতি হয়ে গেছে, সে খুব অসুবিধায় পড়বে। এ ব্যাপারে আমিও তার সাথে একমত যে, সে লোকটি অসুবিধায় পড়বে; কিন্তু এটা আমার জন্য ভালো। আমি ৫ হাজার ডলার অল্প সময়ের মধ্যে ডাকাতির মাধ্যমে অর্জন করে নিতে পারি, তাহলে আমি একটি পাঁচতারা হোটেলে ভালো ভালো খাবার খেতে পারবো।

খ. তুমিও ডাকাতির শিকার হতে পার

কেউ হয়ত বলতে পারে যে, তুমিও অন্য কোনো ডাকাতের ডাকাতির শিকার হতে পারো। আমি বলবো, কেউ আমাকে তার ডাকাতির শিকার বানাতে পারে না। কারণ আমি অত্যন্ত শক্তিশালী অপরাধী। শত শত দেহরক্ষী আমাকে সার্বক্ষণিক ঘেরাও করে রাখে। আমি যে কোনো মানুষকে ডাকাতির শিকার বানাতে পারি। কিন্তু কোনো ডাকাত আমাকে ডাকাতির শিকার বানাতে পারে না। ডাকাতি সাধারণ মানুষের জন্য একটি ঝুঁকিপূর্ণ পেশা হতে পারে; কিন্তু আমার মতো একজন প্রভাবশালী লোকের জন্য নয়।

গ. পুলিশ তোমাকে গ্রেফতার করতে পারে

কেউ হয়তো বলবে যে, তুমি যদি ডাকাতি কর, তাহলে পুলিশ তোমাকে গ্রেফতার করতে পারে। আমি বলবো যে, পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করবে না। কারণ আমি পুলিশকে রীতিমত চাঁদা দিয়ে থাকি। আমি এতে একমত যে, একজন সাধারণ মানুষ ডাকাতি করলে সে শীঘ্রই পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হয়ে যাবে। কিন্তু আমি একজন অত্যন্ত অসাধারণ শক্তিশালী অপরাধী। এটা আমার জন্য মন্দ হওয়ার পক্ষে কেউ আমাকে যুক্তিপূর্ণ একটি কারণ দেখাতে পারলেও তাৎক্ষণিক আমি এটা ছেড়ে দিব।

ঘ. এটা সহজে পাওয়া টাকা

কেউ যুক্তি দেখাতে পারে যে, এটা সহজে পাওয়া টাকা। এটা শ্রমের মাধ্যমে অর্জিত নয়। আমি বলবো যে, আমার ডাকাতি করার আসল কারণতো এটাই। কোনো মানুষের সামনে টাকা উপার্জনের যদি দুটো পথ থাকে—একটি সহজ পথ, অপরটি কঠিন পথ। তবে সে যদি বুদ্ধিমান হয়ে থাকে, সে সহজ পথটিই বেছে নেবে।

ঙ. এ কাজ মানবতা বিরোধী

এ যুক্তিও কেউ দেখাতে পারে যে, এটা মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্য তৎপরতা। মানুষকে অপর মানুষের অধিকারের প্রতি লক্ষ রাখা উচিত। আমি পাল্টা যুক্তি খাড়া করাবো যে, 'মানবতার' এ বিধান কে রচনা করেছে? তার বিধান আমি মানবো কেন?

এ আইন তাদের জন্য ভালো হতে পারে, যারা আবেগপ্রবণ ও দুর্বলচিত্ত লোক। কিন্তু আমি একজন যৌক্তিক ও শক্তিশালী ব্যক্তি, অন্য মানুষের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর মধ্যে আমার কোনো কল্যাণ দেখি না।

চ. এটা একটা স্বার্থপর কাজ

কেউ কেউ এটাকে একটা স্বার্থপর কাজ বলতে পারে। আমি বলবো— এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এটা একটা স্বার্থপর কাজ; কিন্তু আমি স্বার্থপর কেন হবো না? এটাইতো জীবনটাকে উপভোগ করতে আমাকে সাহায্য করে। ডাকাতির কাজটা মন্দ হওয়ার যৌক্তিক প্রমাণ নেই।

অতঃপর ডাকাতির কাজটাকে মন্দ বলে প্রমাণ করার পক্ষে উপস্থাপিত সকল যুক্তি-প্রমাণ ব্যর্থ হয়ে গেল। এসব যুক্তি-প্রমাণ একজন সাধারণ মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারে; কিন্তু আমার মতো একজন যথেষ্ট শক্তিমান ও প্রভাবশালী অপরাধীকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। কোনো যুক্তিই কেবল কার্যকর ও বির্তকের বলিষ্ঠতার উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, পৃথিবী জুড়ে অনেক অপরাধী বিরাজমান।

একইভাবে আমার মতো লোকের জন্য নারী ধর্ষণ ও প্রতারণা প্রভৃতি কাজ খুব ভালো এবং এ কাজগুলো মন্দ হওয়ার পক্ষে এমন কোনো যৌক্তিক কারণ নেই, যা উক্ত কাজগুলোকে মন্দ বলে আমাকে বোঝাতে সক্ষম।

২. একজন মুসলিম শক্তিমান ও প্রভাবশালী একজন অপরাধীকেও বোঝাতে সক্ষম

এবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টাকে দেখা যাক। ধরুন আপনি বিশ্বখ্যাত একজন শক্তিশালী প্রভাবশালী অপরাধী। আপনি পুলিশ এমনকি মন্ত্রীকে পয়সা দিয়ে কিনে রেখেছেন। আপনার নিরাপত্তার জন্য রয়েছে একটা বিশাল অনুগত বাহিনী। আমি একজন মুসলিম। আমি আপনাকে বোঝাতে চাই যে, ডাকাতি, ধর্ষণ, প্রতারণা ইত্যাদি কাজগুলো অত্যন্ত মন্দ। এখন আমি যদি উপরিক্ত যুক্তিগুলো আপনার সামনে পেশ করে আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করি, তা আপনি আগের মতোই উত্তর দেবেন যেমনটা আপনি ইতিপূর্বে দিয়েছেন। আমি আপনার সাথে একমত যে, আপনি যদি অত্যন্ত শক্তিশালী ও প্রভাবশালী অপরাধী হলো, তবে আপনার যুক্তিগুলো যথার্থ সত্য।

৩. প্রত্যেকটি মানুষ সুবিচার চায়

মানুষ যদি অন্যের জন্যে সুবিচার না-ও চায় তবুও সে নিজের জন্য তা কামনা করে। কতেক লোক শক্তি ও প্রভাবের কারণে অবশ্যই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং

অন্যদের দুঃখ কষ্টের কারণে পরিণত হয়। এ লোকেরাই আবার প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে, যখন তাদের প্রতি কোনো অবিচার করা হয়। কারণ এ ধরনের মানুষরা অন্যের দুঃখ-কষ্টের প্রতি অনুভূতিহীন হয়ে থাকার কারণে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির পূজা করে। ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির সহায়তায় তারা অন্যের ওপর অবিচার করতে সুযোগ পাচ্ছে, শুধু তা-ই নয়, ববং অন্যরা যেন তাদের প্রতি একই অন্যায় আচরণ দেখাতে না পারে, তা-ও তারা প্রতিরোধ করছে।

৪. 'আল্লাহ' সবচেয়ে শক্তিমান ও ন্যায়বিচারক

একজন মুসলিম হিসেবে আমি অপরাধীকে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে একথা বলে বোঝাতে চেষ্টা করবো যে, আল্লাহ তোমার চেয়ে অনেক অনেক বেশি শক্তিমান এবং সাথে সাথে তিনি ন্যায়বিচারকও বটে। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে—

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ـ

অর্থ : আল্লাহ কখনো বিন্দুমাত্র অবিচার করেন না। (সূরা নিসা : ৪০)

৫. আল্লাহ আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন না কেন?

অপরাধী, যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনা হবার কারণে আল-কুরআনের বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত সত্যকে তার সামনে পেশ করার পর সে আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে একমত। এখন সে যুক্তি পেশ করতে পারে যে, আল্লাহ যদি শক্তিমান ও ন্যায়বিচারক হয়ে থাকবেন, তাহলে তিনি আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন না কেন?

৬. যারা অন্যায়-অবিচার করে, তাদের শাস্তি হওয়া আবশ্যক

আর্থিক বা সামাজিকভাবে যুলুমের শিকার প্রতিটি ব্যক্তিই চায় যে,যালিমের শাস্তি হোক। প্রতিটি সাধারণ মানুষের আন্তরিক কামনা, ডাকাত, প্রতারক ও ধর্ষকের উচিত শিক্ষা হোক। অসংখ্য অপরাধী যদিও ধরা পড়ছে, তাদের মধ্যে কারো কারো শাস্তি হচ্ছে, কিন্তু আরো অনেক অপরাধী মুক্ত রয়েছে এবং তারা মানুষকে নির্যাতন করেই যাচ্ছে। যখন কোনো শক্তিশালী বা প্রভাবশালী কারোর ওপর তার চেয়ে বেশি শক্তিশালী ও প্রতিপত্তিশালী কারও দ্বারা অত্যাচার-অবিচার হয়, তখন এ অপরাধী লোকটিও তার ওপর যুলুমকারী অপরাধীর শাস্তি দাবি করে।

৭. এ জীবন পরকালীন জীবনের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ

পরকালীন স্থায়ী জীবনে সফলতার সাথে প্রবেশের জন্য ইহকালীন জীবন একটি পরীক্ষা- স্বরূপ। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে—

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ـ

অর্থ : যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যেন তিনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন কর্মের দিক থেকে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম। তিনি তো অত্যন্ত পরাক্রমশালী ও অত্যন্ত ক্ষমাশীল। (সূরা মূল্‌ক্ : ২)

৮. শেষ বিচার দিনেই চূড়ান্ত ফয়সালা

কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে—

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ـ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ـ

অর্থ : প্রতিটি প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে; আর তোমাদেরকে (তোমাদের কাজের) পুরোপুরি প্রতিদান কিয়ামতের দিন দিয়ে দেয়া হবে, ভাল কাজের জন্য পুরস্কার বেহেস্ত এবং খারাপ কাজের প্রতিদান জাহান্নাম। অতঃপর জাহান্নামীকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে, সে-ই চূড়ান্ত সফলতা লাভ করলো। আর দুনিয়ার জীবন তো ধোঁকার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়। (সূরা আলে ইমরান : ১৮৫)

শেষ বিচার দিনেই হবে চূড়ান্ত ফয়সালা। কোনো ব্যক্তি যখন মরে যাবে তাকে পুনরায় শেষ বিচার দিনে পুনরুজ্জীবিত করা হবে সকল মানুষের সাথে। কোনো অপরাধী দুনিয়ার জীবনে তার অপকর্মের কিছু শাস্তি পেয়েও যেতে পারে। তবে চূড়ান্ত শাস্তি বা পুরস্কার তাকে দেয়া হবে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে তথা আখিরাতে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ কোনো ডাকাত বা ধর্ষককে এ দুনিয়াতে শাস্তি না-ও দিতে পারেন; কিন্তু শেষ বিচারের দিনে তাকে অবশ্যই আল্লাহর সামনে জবাবদিহী করতে হবে এবং তাকে সেখানে অবশ্যই বিচারের সম্মুখীন হতে হবে এতে কোনোই সন্দেহ নেই।

৯. হিটলারকে মানবরচিত আইন কী শাস্তি দেবে?

হিটলার তার সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম কালে ৬০ লক্ষ ইহুদিকে পুড়িয়ে মেরেছে। পুলিশ যদি তখন তাকে আটক করতে সক্ষম হতো, তাহলে মানব রচিত আইন ন্যায়বিচার করে তাকে কি শাস্তি দিতে পারতো? বড়জোর তাকে গ্যাস চেম্বারে

ঢুকিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু এতে হয়তো একজন ইহুদিকে হত্যার প্রতিবিধান হতো, কিন্তু বাকি ৫৯ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯ শত ৯৯ জন ইহুদিকে হত্যার বিচার করা সম্ভব হতো কীভাবে?

১০. আখিরাতে হিটলারকে জাহান্নামে ফেলে ৬০ লক্ষ বারের চেয়ে বেশি বারে জ্বালানো একমাত্র আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন—

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ـ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ـ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ـ

অর্থ : নিশ্চয় যারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে, অবশ্যই আমি তাদেরকে আগুনে জ্বালাবো; যখনই তাদের চামড়া জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখনই আমি তাদের চামড়া পাল্টে দেবো অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা এর স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও সুকৌশলী। (সূরা নিসা : ৫৬)

আল্লাহ যদি চান তাহলে তিনি আখিরাতে হিটলারকে ৬০ লক্ষ বার জাহান্নামে পুড়ে মরার স্বাদ আস্বাদন করাতে পারেন।

১১. আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া মানবিক মূল্যবোধ ও ভালো-মন্দের ধারণার কোনো দাম নেই

এখন প্রমাণিত হলো যে, কোনো ব্যক্তিকে আখিরাত তথা মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে আস্থাশীল করা ছাড়া তার মানবিক মূল্যবোধ ও কুফল সম্পর্কে বোঝাতে চেষ্টা করা অর্থহীন, বিশেষ করে সে যদি হয় একজন প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ও শক্তিশালী অত্যাচারী ব্যক্তি।

১৭. দলে-উপদলে মুসলমানদের বিভক্তি প্রথা তাদের চিন্তা-চেতনার পার্থক্য

প্রশ্ন ১৭। সকল মুসলমান যখন একই আল্লাহর কিতাব 'আল-কুরআন মেনে চলে, তাহলে তাদের মধ্যে এত উপদল কেন? তাদের চিন্তা-চেতনায় এতো পার্থক্য কেন?

উত্তর : ১. মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ থাকা উচিত।

এটা সত্য যে আজকের মুসলমানরা অনেক দলে-উপদলে বিভক্ত। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, এ বিভক্তি ইসলামে মোটেই অনুমোদিত নয়। ইসলাম তার অনুসারীদের নিরেট ঐক্যে বিশ্বাসী।

মহাগ্রন্থ আল কুরআন বলে—

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ـ

অর্থ : তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেওনা। (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)

আল্লাহর সেই রুজ্জুটি কি যাকে আঁকড়ে ধরার কথা এ আয়াতে বলা হয়েছে, তা হলো আল-কুরআন। আল-কুরআনই হলো আল্লাহর সেই রুজ্জু বা রশি যাকে ঐক্যবদ্ধভাবে সকল মুসলমানের আঁকড়ে ধরা উচিত। আয়াতে দ্বিগুণ জোর দেয়া হয়েছে, বলা হয়েছে—

'ঐক্যবদ্ধভাবে আঁকড়ে ধরো।' আবার বলা হয়েছে 'পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না'।

আল-কুরআনে আরো বলা হয়েছে—

اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ ـ

অর্থ : তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রাসূলের। (সূরা নিসা : ৫৯)

অতএব মুসলমানদের আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসসমূহের অনুসরণ করা উচিত এবং পরস্পর মতপার্থক্য করা উচিত নয়।

২. ইসলামে দলাদলী ও বিভক্তি নিষিদ্ধ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন—

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِىْ شَيْئٍ اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ـ

অর্থ : নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে আপনার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। তাদের বিষয় আল্লাহর হাতে ন্যস্ত। অতঃপর তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন, যা তারা করতো। (সূরা আন্‌আম : ১৫৯)

এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেছেন যে, যারা নিজেদের দ্বীনকে ভাগ করে নিয়েছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা উচিত।

কিন্তু যখন একজন মুসলিম প্রশ্ন করে বসে, আপনি কে? তখন আমাদের একটি সাধারণ উত্তর হলো, 'আমি একজন সুন্নী' অথবা' আমি একজন শিয়া' অনেকে তাদের নিজেদেরকে' হানাফী' অথবা' শাফেয়ী' অথবা 'মালেকী' অথবা 'হাম্বলী' বলে পরিচয় দেয়। আবার অনেকে বলে, 'আমি একজন দেওবন্দি' আর কেউ কেউ বলে 'আমি একজন বেরলভী'।

৩. আমাদের নবী ছিলেন একজন মুসলিম মাত্র

কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, 'আমাদের প্রিয়নবী ﷺ কি ছিলেন? তিনি কি 'হানাফী' ছিলেন না-কি 'শাফেয়ী' না-কি 'মালেকী না-কি 'হাম্বলী'-এর উত্তর হলো— 'না, তিনি পূর্বে আগত নবী-রাসূলদের মতোই একজন মুসলিম ছিলেন। আল কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ৫২ নং আয়াতে বলা হয়েছে—

فَلَمَّا اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِىْ اِلَى اللّٰهِ ـ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ـ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ـ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ـ

ঈসা (আ) ও তাঁর অনুসারীরা মুসলিম ছিলেন। উক্ত সূরার ৬৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) ইয়াহুদি বা খ্রিস্টান কোনটাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন খাঁটি মুসলিম।

কেউ যদি কোনো মুসলমানকে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কে?' তখন উত্তরে তার বলা উচিত যে, 'আমি একজন মুসলিম—'হানাফী'ও নয়, 'শাফেয়ী'-ও নয়।'

আল্লাহ বলেন—

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ـ

৪. আল-কুরআন নিজেদেরকে 'মুসলিম' বলে পরিচয় দিতে বলে

নবী করিম ﷺ অমুসলিম রাজা-বাদশাহদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে চিঠি লিখিয়ে ছিলেন। সেসব চিঠিতে তিনি সূরা আলে ইমরানের নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখ করেছিলেন—

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صٰلِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ فَقُوْلُوْا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ـ

অর্থ : আর তার চেয়ে কার কথা অধিক উত্তম, যে মানুষকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করে এবং নিজেও সৎকাজ করে। আর বলে, আমিতো একজন 'মুসলিম' তথা আত্মসমর্পণকারী।' (আল-কুরআন ৪১ : ৩৩)

৫. ইসলামের সুবিজ্ঞ মহান ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান

আমাদেরকে অবশ্যই ইসলামের সুবিজ্ঞ মহান আলেমদের প্রতি সম্মান জানাতে হবে, যাদের মধ্যে রয়েছে চার ইমাম : যথা ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইমাম মালিক (র.)।

আল্লাহ তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। তাঁরা ছিলেন ইসলামের জ্ঞানে সুবিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ তাঁদেরকে তাঁদের জ্ঞান-গবেষণার জন্য উত্তম পুরস্কার দান করুন। সর্ব সাধারণ মানুষের মধ্যে কেউ ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে কারো অনুসরণ করলে কোনো ক্ষতি নেই; কিন্তু 'তুমি কে?' এ প্রশ্নের উত্তরে তাকে বলতে হবে যে, আমি একজন মুসলিম।

কেউ কেউ সুনানে আবু দাউদের ৪৫৭৯ নং হাদীসটির উদ্ধৃতি দিয়ে যুক্তি দেখাতে পারেন যে, এ বিভক্তির কথা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে গেছেন। উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে।'

হাদীসটির মর্ম হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতের পরিণতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, তাঁর উম্মতের অবস্থা এমন হবে যে, তারা মতপার্থক্যে জড়িয়ে পড়বে, এমনকি তারা ৭৩টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তিনি একথা বলেন নি যে, তাঁতে উম্মতকে ৭৩টি দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করতে হবে। কুরআন মাজীদ আমাদেরকে দল-উপদল সৃষ্টি করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। যারা কুরআন ও সহীহ হাদীসের নির্দেশ মেনে চলে এবং দল-উপদল সৃষ্টি করে না, তারাই সঠিক সত্য পথে আছে।

তিরমিযীর ১৭১ নং হাদীস অনুসারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আমার উম্মতগণ ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে, এবং একটি দল ছাড়া বাকি সব দলই জাহান্নামে যাবে।' সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! সেই দল কোনটি হবে?' তিনি উত্তরে বললেন, 'সেই দলটি হবে যার মধ্যে আমি এবং আমার সাহাবায়ে কিরাম থাকবো।'

কুরআন মাজীদের বেশ কিছু আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং আনুগত্য করো তাঁর রাসূলের'। একজন খাঁটি মুসলমানের উচিত হলো আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন এবং তাঁতে রাসূলের সহীহ হাদীসসমূহের নির্দেশ মেনে চলা। সে যে কোনো ইসলাম বিশেষজ্ঞের মত অনুসরণ করতে পারে, যদি সে বিশেষজ্ঞ আল কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসারী হয়ে থাকে। কিন্তু যদি তাঁর মত আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সহীহ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হয়,

তাহলে তার মতের কোনো মূল্যই নেই— এতে সে যত বড় বিশেষজ্ঞই হোক না কেন।

যদি সকল মুসলমান কুরআনকে বুঝে পড়ে এবং সেই মূলনীতি অনুসারে রাসূলের হাদীসকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়নের চেষ্টা চালায়, তবে ইনশাআল্লাহ সকল মত পার্থক্য দূর হয়ে যাবে এবং আমরা সকলেই একটি ঐক্যবদ্ধ মুসলিম উম্মাহ হিসেবে গড়ে উঠবো।

১৮. সকল ধর্মই মানুষকে সত্য ও কল্যাণের শিক্ষা দেয় তাহলে শুধু ইসলামকে অনুসরণ করতে হবে কেন?

প্রশ্ন ১৮। মৌলিকভাবে সব ধর্মই তার অনুসারীদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেয়, তাহলে একজন লোককে শুধু ইসলামকে অনুসরণ করে চলতে হবে কেন? সে কি অন্য কোনো ধর্ম মেনে চলতে পারে না?

উত্তর :

১. ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য

সব ধর্মই মানুষকে মন্দ থেকে বেঁচে থেকে সৎপথে চলার পরামর্শ দেয়। তবে ইসলামে এর বাইরে কিছু রয়েছে। ইসলাম আমাদেরকে ন্যায় ও সত্যকে পাওয়ার জন্য এবং মন্দকে দূর করার জন্য আমাদের ব্যক্তি জীবন থেকে নিয়ে সামষ্টিক জীবনে ব্যবহারিক পন্থা অনুসরণ করার দিক-নির্দেশনা দেয়। ইসলাম মানুষের স্বভাব প্রকৃতি ও তার সমাজের জটিলতাকে বিবেচনায় রাখে। ইসলাম হলো স্বয়ং স্রষ্টার পক্ষ থেকে দিকনির্দেশ। সুতরাং ইসলামকে 'দ্বীনুল ফিতরাহ' তথা মানুষের স্বভাবজাত জীবনব্যবস্থা' বলা হয়।

২. উদাহরণ— যেমন ইসলাম আমাদের ডাকাতি ও রাহাজানি দূর করতে নির্দেশ দেয়, সাথে সাথে ডাকাতি ও রাহাজানি দূর করার পদ্ধতিও বাতলে দেয়।

ক. ইসলাম ডাকাতি ও রাহাজানি নির্মূল করার পদ্ধতি বাতলে দেয়

সব কটি প্রধান ধর্মই চুরি ও ডাকাতিকে একটি মন্দ কাজ বলেই শিক্ষা দিয়ে থাকে; ইসলামও একই শিক্ষা দেয়। সুতরাং ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে পার্থক্য কোথায়, সত্যি বলতে কি ইসলাম 'চুরি-ডাকাতি একটি মন্দ কাজ' এ শিক্ষা দেয়ার সাথে সাথে এমন একটি সমাজ গড়ার ব্যবহারিক পদ্ধতি দেখিয়ে দেয়, যেখানে মানুষ চুরি-ডাকাতি করবে না।

খ. ইসলাম যাকাতের বিধান দেয়

ইসলাম যাকাতের বিধান বাস্তবায়নের নির্দেশ দান করে। এটি বাধ্যতামূলক বার্ষিক একটি দান বিশেষ। ইসলামি আইনের বিধান হলো– এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যার সঞ্চিত সম্পদের পরিমাণ 'নিসাব' পর্যন্ত পৌঁছে অর্থাৎ ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের মূল্য পরিমাণ অথবা ৫২·৫ তোলা রৌপ্যের মূল্য পরিমাণ পৌঁছে, তাকে প্রতি চান্দ্র বছরে বাধ্যতামূলকভাবে তার সঞ্চিত সম্পদের ২.৫% ভাগ যাকাত দিতে হবে। এ বিধান অনুসারে বিশ্বের প্রতিটি ধনী লোক যথাযথভাবে হিসেব করে যাকাত দেয়, তাহলে সমগ্র বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য নির্মূল হয়ে যাবে। এর ফলে পৃথিবীতে একটি মানুষও অনাহারে মারা যাবে না।

গ. চুরি-ডাকাতির শাস্তির বিধান হলো হাত কেটে দেয়া

ইসলাম চুরি-ডাকাতি বন্ধ করার জন্য চোর-ডাকাতের হাত কেটে দেয়ার বিধান পেশ করে। কুরআন মাজীদের সূরা আল-মায়েদায় আল্লাহ বলেন—

اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -

অর্থ : আর তোমরা চোর বা চুরনীর হাত কেটে দাও, তারা যা করেছে তার শাস্তি এটাই। তাদের অপরাধের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে : আর আল্লাহ পরাক্রমশালী সুবিজ্ঞ। (আল-কুরআন ৫ : ৩৮)

অমুসলিমরা বলতে পারে যে, 'এ বিংশ শতাব্দীতে হাত কাটা— ইসলাম একটি বর্বর ও নিষ্ঠুর ধর্ম।'

ঘ. ইসলামি শরীআহ আইন বাস্তবায়িত হলেই এর সুফল পাওয়া যাবে

ধরে নেয়া যাক, আমেরিকা বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত একটি রাষ্ট্র। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেখানে বিশ্বের সবচেয়ে অধিক হারে অপরাধ সংঘটিত হয় চুরি-ডাকাতির মাধ্যমে। মনে করুন আমেরিকাতে ইসলামি শরীআহ আইন জারি করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি যাকাত (সঞ্চিত সম্পদের ২.৫% অর্থাৎ ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের উপরে চন্দ্র বার্ষিক বাধ্যতামূলক দান) দেয় এবং প্রত্যেক সাজাপ্রাপ্ত পুরুষ বা মহিলার হাত কেটে দেয়া হয়, তাদের অপরাধের শাস্তি হিসেবে। এখন বলুন, অতঃপর আমেরিকাতে চুরি-ডাকাতি বাড়বে না-কি একই থাকবে অথবা কমে যাবে? স্বভাবত এটা কমে যাবে। এ ধরনের কঠিন আইন জারি থাকলে অনেক স্বভাবগত অপরাধী নিজেকে ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হবে।

ফলে ভবিষ্যতে সম্ভাবনাময় চোরও নিজেকে সংশোধন করে নেবে এবং চুরি ও ডাকাতি নির্মূল হয়ে যাবে।

আমি বিশ্বাস করি যে, বর্তমান বিশ্বে চোর-ডাকাতের যে বিশাল সংখ্যা রয়েছে তাতে যদি তাদের হাত কাটা হয় তাহলে দেখা যাবে পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ লোকের হাত কাটা। তবে ব্যাপারটা হলো– যখনই হাত কাটার বিধান জারি হবে, তার পর মুহূর্ত থেকেই চুরি-ডাকাতির সংখ্যা কমে যাবে। পেশাধারী চোরও এ পথে পা বাড়াবার আগে একবার পরিণতির কথা ভেবে দেখবে যে, ধরা পড়লে তার পরিণতি কেমন হবে। শাস্তির ভয়াবহতাই অধিকাংশ চোর-ডাকাতের ইচ্ছাকে দমন করার জন্য যথেষ্ট। অতঃপর নিতান্ত দুর্ভাগা ছাড়া এ পেশায় কেউ টিকে থাকবে না। অতএব একান্ত নগণ্য সংখ্যক লোকের হাত-ই শুধু কাটা যাবে। ফলে কোটি কোটি লোক চুরি-ডাকাতির ভয় থেকে নিরাপত্তা পেয়ে শান্তিতে বাস করবে। আর চুরি-ডাকতি বন্ধ হওয়ার ফলে অনেক চোরের হাত-ই কাটা যাওয়া থেকে বেঁচে যাবে। অতএব ইসলামি আইন অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ও ফলপ্রসূ।

৩. উদাহরণ :

ইসলাম উৎপীড়ন ও ধর্ষণের মত জঘন্য কাজকে নিষিদ্ধ করেছে। 'হিজাব' বা পর্দাকে বিধিবদ্ধ করেছে এবং প্রমাণিত ধর্ষণের শাস্তি হিসেবে মৃত্যু দণ্ডের বিধান দিয়েছে :

ক. নারী উৎপীড়ন ও ধর্ষণ নির্মূল করার পদ্ধতি দিয়েছে ইসলাম

সব কটি প্রধান ধর্মই নারী-উৎপীড়ন ও ধর্ষণকে জঘন্য পাপ বলে ঘোষণা করেছে। ইসলামের শিক্ষাও তাই। তাহলে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য হলো— ইসলাম নারীদের মর্যাদা রক্ষার উপদেশ দিয়েই এবং নারীদেরকে উৎপীড়ন ও ধর্ষণকে জঘন্য অপরাধ বলে ঘোষণা দিয়েই থেমে থাকে না; বরং সমাজ থেকে এ জঘন্য অপরাধ যাতে নির্মূল হয়ে যায় তার পরিষ্কার দিক নির্দেশনা দিয়েছে।

খ. পুরুষের জন্য পর্দা

ইসলামে রয়েছে পর্দার বিধান। ইসলাম প্রথমে পুরুষের জন্য পর্দার কথা ঘোষণা করেছে। অতঃপর ঘোষণা করেছে নারীর পর্দার কথা। নিম্নোক্ত আয়াতে পুরুষের পর্দার কথা ঘোষিত হয়েছে —

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ - ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ - اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ -

অর্থ : আপনি মুমিন পুরুষদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে। এটা তাদের জন্য উত্তম। নিশ্চয়ই তারা যা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত। (আল-কুরআন ২৪ : ৩০)

পুরুষের দৃষ্টি নারীর প্রতি পড়লে যদি তার মনে কোনো অশ্লীল ও লজ্জাকর চিন্তা এসে যায়, তাই তাৎক্ষণিক তার দৃষ্টি নামিয়ে নেয়া উচিত।

গ. নারীর জন্য পর্দা

এ আয়াতে নারীর পর্দার কথা উল্লেখ করা হয়েছে —

قُلْ لِلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ .....

অর্থ : আর আপনি মুমিন নারীদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে; আর তারা যেন সাধারণভাবে প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। আর তারা যেন তাদের চাদর স্বীয় বুকের ওপর জড়িয়ে রাখে; আর তারা যেন নিজেদের সৌন্দর্য কারো কাছে প্রকাশ না করে এদের ছাড়া– তাদের স্বামী, তাদের পিতা, তাদের শ্বশুর, তাদের পুত্র..। (আল-কুরআন ২৪ : ৩১)

নারীর জন্য বর্ধিত 'হিজাব' তথা পর্দা হলো তার পুরো শরীর (ঢিলে ঢালা) পোশাক দ্বারা ঢাকা থাকতে হবে, কেবল মুখমণ্ডল কব্জী পর্যন্ত দু'হাত খোলা থাকবে। তবে তারা যদি চায় তা-ও ঢেকে নিতে পারে। ইসলামি আইনের কতেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি মুখমণ্ডল ঢাকার ওপর জোর দিয়েছেন।

ঘ. 'হিজাব' নারীকে উৎপীড়ন থেকে বাঁচায়

আল্লাহ তাআলা নারীর জন্য পর্দার বিধান কেন দিয়েছেন– তার কারণ সূরা আহযাবের নিচের আয়াতে উল্লেখ করেছেন —

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا .

অর্থ : হে নবী! আপনি আপনার পত্নীদেরকে, আপনার কন্যাদেরকে এবং মুমিন নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের ওড়না নিজেদের ওপর টেনে দেয়। এতে সহজেই তাদের পরিচয় পাওয়া যাবে। ফলে তারা নির্যাতিতা হবে না; আর আল্লাহ হলেন অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (সূরা আহযাব : ৫৯)

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন বলে যে, নারীর জন্য 'হিজাব' এর বিধান দেয়া হয়েছে, যাতে তারা সম্ভ্রান্ত মহিলা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এটা তাদেরকে উত্যক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করবে।

ঙ. যমজ দু' বোনের উদাহরণ

ধরা যাক, দু বোন যমজ এবং তারা উভয়েই সুন্দরী; তারা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। তাদের একজন ইসলামি 'হিজাব' বা পর্দাবৃতা অর্থাৎ মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত দু হাত ছাড়া সমস্ত শরীর ঢাকা। অন যমজ বোনটি মিনিস্কার্ট বা সর্টস (সংক্ষিপ্ত পোশাক) পরিহিতা। রাস্তার মোড়ে এক বখাটে যুবক, যে কোনো মেয়েকে উত্যক্ত করার সুযোগ খুঁজে ফিরছে। বলুন তো, বখাটে যুবকটি কোন্ মেয়েটিকে উত্যক্ত করবে? যে মেয়েটি ইসলামি 'হিজাব' ঢাকা তাকে, না-কি যে মেয়েটি মিনি স্কার্ট বা সর্টস্ পরা তাকে? পোশাক-ই তা প্রকাশ করে, যা তারা গোপন করতে চায় এবং এর দ্বারাই বিপরীত লিঙ্গকে উত্যক্ত করা ও ধর্ষণ করার আমন্ত্রণ জানানো হয়ে থাকে। কুরআন মাজীদ সঠিক বলেছে যে, পর্দা নারীদেরকে পুরুষের নির্যাতন থেকে রক্ষা করে।

চ. ধর্ষকের জন্য চরম শাস্তি

ইসলামি শরীআহ প্রমাণিত ধর্ষকের জন্য চরম শাস্তি নির্ধারণ করেছে। আধুনিক যুগে এ ধরনের কঠোর শাস্তির কথা শুনে অমুসলিমরা ভীত হয়ে পড়তে পারে। অনেকে ইসলামকে নিষ্ঠুর বর্বতার দোষে দোষারোপ করতে পারে। আমি শত শত অমুসলিম পুরুষকে একটি প্রশ্ন করেছি। ধরা যাক, আল্লাহ ক্ষমা করুন, কোনো নরাধম আপনার স্ত্রী, মাতা এবং কন্যাকে ধর্ষণ করেছে। আপনি বিচারকের আসনে উপবিষ্ট, ধর্ষককে আপনার সামনে আনা হয়েছে। আপনি তাকে কি শাস্তি দেবেন? প্রশ্নকৃত সবাই বলেছে যে, 'আমরা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবো।' কিছু লোকতো এমন বলেছে যে, 'আমরা তাকে তিলে তিলে যন্ত্রণা দিয়ে মারবো।' এখন প্রশ্ন হলো, আপনি আপনার স্ত্রী, মাতা ও কন্যার ধর্ষককে মৃত্যুদণ্ড দেবেন, কিন্তু অপর কারো স্ত্রী, মাতা ও কন্যার ধর্ষকের জন্য নির্ধারিত শাস্তিকে আপনি বর্বরতা বলে বেড়াবেন– এমন দ্বিমুখী ভূমিকা কেন?

ছ. আমেরিকায় ধর্ষণের রেকর্ড সর্বোচ্চ

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রগুলোর অন্যতম। ১৯৯০ সালের একটি এফ. বি. আই-এর ফেডারেল ব্যুরো অব ইনটেলিজেন্স রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, সে দেশে উক্ত বছরে ১,০২,৫৫৫টি ধর্ষণের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। ধর্ষণের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য নথিভুক্ত সংখ্যাকে ৬. ২৫ দিয়ে গুণ করলে দাঁড়ায় ৬,৪০, ৯৬৮। এটা হলো আমেরিকায় ১৯৯০ সালে সংঘটিত ধর্ষণের ঘটনা। মোট সংখ্যাকে ৩৬৫ দিয়ে ভাগ করে আমরা পাই ১,৭৫৬ যা সেই দেশে দৈনিক গড়ে সংঘটিত ধর্ষণের ঘটনা।

পরবর্তী অন্য একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, আমেরিকাতে গড়ে দৈনিক ১৯০০ ধর্ষণের ঘটনা ঘটে থাকে। ন্যাশনাল ক্রাইম ভিকটিমাইজেশন সার্ভে, ব্যুরো অব জাস্টিস স্ট্যাটিসটিক্স (ইউ.এস. ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস)-এর পরিসংখ্যান অনুসারে শুধু ১৯৯৬ সালেই ৩,০৭,০০০ ধর্ষণের ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, প্রকৃত ঘটনার সর্বোচ্চ ৩১% ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করা হয়ে থাকে। বাকি ঘটনায় অভিযোগ না করে নিরব থাকা হয়। অতএব ৩.০৭০০০× ৩.২২৬ = ৯.৯০,৩২২টি ধর্ষণের ঘটনা ১৯৯৬ সালে আমেরিকাতে সংঘটিত হয়েছে। তাহলে ১৯৯৬ সালে আমেরিকাতে গড়ে দৈনিক ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৯,৯০,৩২২ ÷ ৩৬৫ = ২,৭১৩টি। উক্ত বছরে প্রতি ৩২ সেকেন্ডে একটি করে ধর্ষণের ঘটনা সেখানে সংঘটিত হয়েছে। সম্ভবত আমেরিকান ধর্ষকেরা ক্রমান্বয়ে হিংস্র হয়ে উঠছে। এফ.বি.আই-এর ১৯৯০ সালের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, নথিভুক্ত ঘটনায় ১০% ধর্ষককে গ্রেফতার করা হয়েছে। অর্থাৎ ধর্ষণের ঘটনার মোট সংখ্যার মাত্র ১.৬% ধর্ষকের শাস্তি হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের ৫০% অপরাধী বিচার কর্ম শুরু হওয়ার আগেই ছাড়া পেয়ে যায়। এতে করে গ্রেফতারকৃতদের কেবল ০.৮% অপরাধী বিচারের সম্মুখীন হয়। অন্য কথায় যদি কোনো অপরাধী যদি ১২৫টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটায়, তাহলে তার সাজা পাবার আশঙ্কা মাত্র একটি ঘটনায়। অনেক ধর্ষক এটাকে একটা নিশ্চিন্ত বাজি ও জুয়ার মতো ধরে নিতে পারে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, যেসব অপরাধী বিচারের সম্মুখীন হয়, তাদের ৫০% এর শাস্তি হয় এক বছরেরও কম সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে। যদিও আমেরিকার আইনে ধর্ষণের শাস্তি ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আমেরিকার বিচারকরা প্রথমবার ধর্ষকের প্রতি নমনীয় রায় দেন। চিন্তা করে দেখুন, কোনো ব্যক্তি ১২৫ বার ধর্ষণের পর মাত্র একবার সাজাপ্রাপ্ত হয় এবং ৫০% ধর্ষকের প্রতি বিচারকরা নমনীয় রায় দেন অর্থাৎ ১ বছরের কম সময়ের কারাদণ্ড দেন।

জ. ইসলামি শরীআহ আইন জারি হলে এর সুফল অবশ্যই পাওয়া যাবে

মনে করুন আমেরিকাতে ইসলামি আইন জারি হয়েছে। কোনো পুরুষের দৃষ্টি কোনো নারীর প্রতি পড়লে সে তার মনে কোনো কুচিন্তা আসার আশঙ্কায় সঙ্গে সঙ্গেই তার দৃষ্টি নামিয়ে নিচ্ছে। নারীরা ইসলামি 'হিজাব'-এর বিধান মেনে চলছে অর্থাৎ মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হাত ছাড়া সর্বাঙ্গ ঢেকে চলাফেরা করছে। এর পরেও যদি কোনো ব্যক্তি ধর্ষণের ঘটনা ঘটায়, তাকে চরম শাস্তি 'মৃত্যুদণ্ড দেয়া হচ্ছে। এ অবস্থায় কোনো মতেই ধর্ষণের অপরাধ বাড়তে তো পারেই না; এমনকি স্থিরও থাকতে পারে না; বরং এ অপরাধ কমতে বাধ্য।

৪. ইসলাম মানবীয় সমস্যার বাস্তবমুখী সমাধান দেয়

ইসলাম মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম জীবনব্যবস্থা। কারণ এর বিধানসমূহ কেবল তত্ত্বগত বুলি নয়; বরং তা হচ্ছে মানব সন্তানদের এক বাস্তবমুখী কল্যাণধর্মী বিধান। ইসলামের বিধানসমূহ যেমন ব্যক্তির জন্য কল্যাণকর, তেমনি সামষ্টিক পর্যায়েও এ বিধানসমূহ অনন্য কল্যাণকর ব্যবস্থা। ইসলাম সর্বকালের সকল মানুষের জন্য সর্বোত্তম জীবন ব্যবস্থা, কারণ এটা সবচেয়ে বাস্তবমুখী, বিশ্বজনীন ব্যবস্থা, যা বিশেষ কোনো জাতি-গোষ্ঠির জন্য নির্ধারিত নয়।

১৯. ইসলাম ও মুসলমানদের বর্তমান অনুশীলনের মধ্যে অনেক পার্থক্য

প্রশ্ন ১৯। ইসলাম যদি সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম হয়, তাহলে মুসলমানদের মধ্যে এত অসৎ ,অবিশ্বস্ত, অনির্ভর যোগ্য লোক কেন? আর কেনই বা তারা প্রতারণা ভ্রান্ত আসক্তি ইত্যাদি অসামাজিক কাজের সাথে জড়িত?

উত্তর :

১. প্রচার মাধ্যমগুলোর অপপ্রচার

ক. ইসলাম নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম; তবে প্রচার মাধ্যমগুলো পাশ্চাত্য বাসীদের হাতে। যারা ইসলামকে ভয় পায়। এসব প্রচার মাধ্যম অনবরত ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ভুল তথ্যাবলি প্রচার করে যাচ্ছে। ছেপে চলছে মিথ্যা তত্ত্ব ও তথ্যাবলি। অথবা তারা আংশিক সত্যকে পুরোপুরি সত্যে পরিণত করে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

খ. পৃথিবীর কোথাও কোনো বোমা বিস্ফোরিত হলে, কোনো প্রমাণ ছাড়াই পশ্চিমারা সর্বপ্রথম সেটাকে মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে প্রচারণা শুরু করে দেয়। পত্র-পত্রিকায় এটাকেই ব্যানার হেডিং করে ছেপে দেয়। পরবর্তীতে যদি প্রমাণিত হয় যে, এ বিস্ফোরণের জন্য কোনো অমুসলিম দায়ী, তখন এটাকে গুরুত্বহীনভাবে পরিত্যাগ করে।

গ. ৫০ বছর বয়স্ক কোনো মুসলমান যদি ১৫ বছর বয়সের কোনো মেয়েকে তার সম্মতিতেই বিয়ে করে, তখন এটা পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপার মতো একটি ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। আর ৫০ বছর বয়স্ক কোনো অমুসলিম যদি ৬ বছরের কোনো বালিকাকে ধর্ষণ করে, তখন এটা পত্রিকার ভেতরের পাতায় সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ-এর কলামে ছাপা হয়। আমেরিকাতে গড়ে প্রতিদিন ২,৭১৩টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে; কিন্তু এসব ঘটনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় না। যেহেতু এসব ঘটনাইতো আমেরিকানদের দৈনন্দিন জীবনের একটা অংশ।

২. লঙ্কায়ও ভিখেরি আছে

আমি ভালো করেই জানি যে, কতেক মুসলমান অসৎ, অনির্ভরযোগ্য যারা প্রতারণা ইত্যাদি অপকর্মের সাথে জড়িত। কিন্তু প্রচার মাধ্যমগুলো এটাকে এমনভাবে চিহ্নিত করে যে, শুধু মুসলমানরাই এসব অপকর্মের সাথে জড়িত। প্রত্যেক সমাজেই অসৎ লোক আছে এবং থাকবে। আমি জানি, মুসলিম সমাজেও মদ্যপায়ী লোক আছে ও থাকবে। কিন্তু যারা মদ্যপায়ী এবং তৎসঙ্গে অন্য অনেক অপকর্মের সাথে জড়িত, তাদের অধিকাংশই অমুসলিম।

৩. সামগ্রিকভাবে মুসলমানরাই শ্রেষ্ঠ

মুসলিম সমাজে কিছু কিছু অসৎ লোকের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও মুসলমানরা এবং মুসলিম সমাজ পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ। সামগ্রিকভাবে আমরাই মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত সর্ববৃহৎ সমাজ। আমরাই সামাজিকভাবে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি দান-দক্ষিণা করে থাকি। নৈতিকতা, সংযম, সহনশীলতা, পারস্পরিক সহানুভূতি ও মানবিক মূল্যবোধের প্রশ্নে এখনও মুসলমানরাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

৫. গাড়ির চালক দিয়ে গাড়ির বিচার করবেন না

আপনি যদি কোনো গাড়ি সম্পর্কে তা কতটুকু ভালো বা মন্দ, তা জানতে চান, তাহলে ড্রাইভিং সিটে এমন একজন এক্সপার্ট ড্রাইভারকে বসাতে হবে যে গাড়ি সম্পর্কে যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্যের জ্ঞান রাখেন। একইভাবে ইসলামকে জানতে হবে তার সঠিক বাস্তবায়নকারী ও যথার্থ অনুসারী আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ থেকে। বিশ্বের মুসলিম মনীষিগণ ছাড়াও অমুসলিম নিরপেক্ষ ইতিহাসবিদ রয়েছেন, যারা পক্ষপাতহীনভাবে দাবি করেছেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন মানব জাতির শ্রেষ্ঠতম মানুষ। বিখ্যাত ঐতিহাসিক মাইকেল এইচ. হার্ট যিনি 'The Hurdred most Influential men in History'(মানব ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী একশত ব্যক্তি) নামক বইয়ের রচয়িতা। তিনি মুহাম্মাদ ﷺ-কে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি আমাদের প্রিয় নবীকে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়ে তালিকার প্রথম স্থান দিয়েছেন। তাছাড়া থমাস কার্লাইল ও লা-মার্টিন এবং আরো অনেক অমুসলিম ঐতিহাসিক নিরপেক্ষ বিচারে মুহাম্মাদ ﷺ-কে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছেন।

২০. অমুসলিমদের 'কাফির' বলা

প্রশ্ন ২০। মুসলমানরা অমুসলিমদেরকে 'কাফির' বলে আখ্যায়িত করে কেন?

উত্তর :

১. 'কাফির' অর্থ অস্বীকারকারী

'কাফির' শব্দটি 'কুফর' শব্দ থেকে উদ্ভূত। শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'গোপন করা' অস্বীকার করা বা প্রত্যাখ্যান করা। ইসলামের পরিভাষায় 'কাফির' এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে ইসলামের সত্যকে গোপন করে বা প্রত্যাখ্যান করে। ইংরেজিতে যাকে আমরা 'নন-মুসলিম' বলে থাকি।

২. অমুসলিমরা এতে মনোকষ্ট পেলে তাদের উচিত ইসলামকে গ্রহণ করে নেয়া

কোনো 'অমুসলিম' যদি 'কাফির' তথা 'নন-মুসলিম' শব্দটিকে 'গালি' মনে করে তবে তার উচিত ইসলাম গ্রহণ করে 'মুসলিম' জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া। আর তখনই কেবল আমরা তাকে 'কাফির' আখ্যায়িত করা থেকে বিরত থাকতে সক্ষম হবো। নচেৎ যতদিন সে ইসলামের বাইরে থাকবে, ততদিন তাকে 'কাফির' তথা 'অমুসলিম' বলা ছাড়া আর কি-ই বা বলা যেতে পারে?

সমাপ্ত

পিস পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত বই সমূহ

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	THE HOLY QURAN (আরবী-বাংলা-ইংরেজী)	১০০০
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN	২০০
৩.	বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও হাদীস	৩৫০
৪.	কিতাবুত তাওহীদ	১৫০
৫.	রাসুলুল্লাহ (স.) এর হাসি কান্না ও জিকির	২১০
৬.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা	১৫০
৭.	রাসুলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন	১৪০
৮.	বাছাইকৃত ১০০ হাদীসে কুদসী	১৫০
৯.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন	৭০
১০.	জান্নাতী ২০ (বিশ) রমণী	২০০
১১.	জান্নাতী ২০ (বিশ) সাহাবী	২০০
১২.	রাসূল (স.) সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন	১৪০
১৩.	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন	২২০
১৪.	রাসূল (স.) লেনদেন ও বিচার ফয়সালা করতেন যেভাবে	২২৫
১৫.	রাসূল (স.) জানাযার নামাজ পড়াতেন যেভাবে	১৩০
১৬.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা	২২৫
১৭.	কিয়ামতের আলামত ও বর্ণনা	২২৫
১৮.	কবরের বর্ণনা (সাওয়াল জওয়াব)	১৫০
১৯.	দোয়া কবুলের পূর্বশর্ত	১০০

জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ

১.	বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা	৫০
২.	ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য	৫০
৩.	ইসলামের ওপর ৪০টি অভিযোগ ও তার প্রমাণভিত্তিক জবাব	৬০
৪.	প্রশ্নোত্তরে ইসলামে নারীর অধিকার -আধুনিক নাকি সেকেলে?	৫০
৫.	আল কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান	৫০
৬.	কুরআন কি আল্লাহর বাণী?	৫০
৭.	ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের কিছু সাধারণ প্রশ্নের জবাব	৫০
৮.	মানব জীবনে আমিষ খাদ্য বৈধ না নিষিদ্ধ?	৪৫
৯.	ইসলামের কেন্দ্র বিন্দু	৫০
১০.	সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ	৫০
১১.	বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব	৫০
১২.	কেন ইসলাম গ্রহণ করছে পশ্চিমারা?	৫০
১৩.	সন্ত্রাসবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য?	৫০
১৪.	বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন	৫০
১৫.	সুদমুক্ত অর্থনীতি	৫০
১৬.	সালাত : রাসূলুল্লাহ (স.) এর নামায	৬০
১৭.	ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্মের সাদৃস্য	৫০
১৮.	ধর্মগ্রন্থসমূহের আলোকে হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম	৫০
১৯.	আল কুরআন বুঝে পড়া উচিৎ	৫০
২০.	চাঁদ ও কুরআন	৫০
২১.	মিডিয়া এন্ড ইসলাম	৫৫
২২.	সুন্নাত ও বিজ্ঞান	৫৫
২৩.	পোষাকের নিয়মাবলী	৪০
২৪.	ইসলাম কি মানবতার সমাধান?	৬০
২৫.	বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ (সা.)	৫০
২৬.	বাংলার তাসলিমা নাসরীন	৫০
২৭.	ইসলাম এবং সেকিউল্যারিজম	৫০
২৮.	যিশু কি সত্যই ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিল?	৫০
২৯.	সিয়াম : আল্লাহ'র রাসূল (স.) রোজা রাখতেন যেভাবে	৫০
৩০.	আল্লাহ'র প্রতি আহ্বান তা না হলে ধ্বংস	৪৫
৩১.	মুসলিম উম্মাহর ঐক্য	৫০
৩২.	জ্ঞানার্জন : জাকির নায়েক স্কুল পরিচালনা করেন যেভাবে	৫০
৩৩.	ইশ্বরের স্বরূপ ধর্ম কী বলে?	৫০

জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র

১.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-১	৪০০	৪.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৪	৩৫০
২.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-২	৪০০	৫.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৫	৪০০
৩.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৩	৩৫০	৬.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৬	২৫০